মাহে রমযান

رمضان

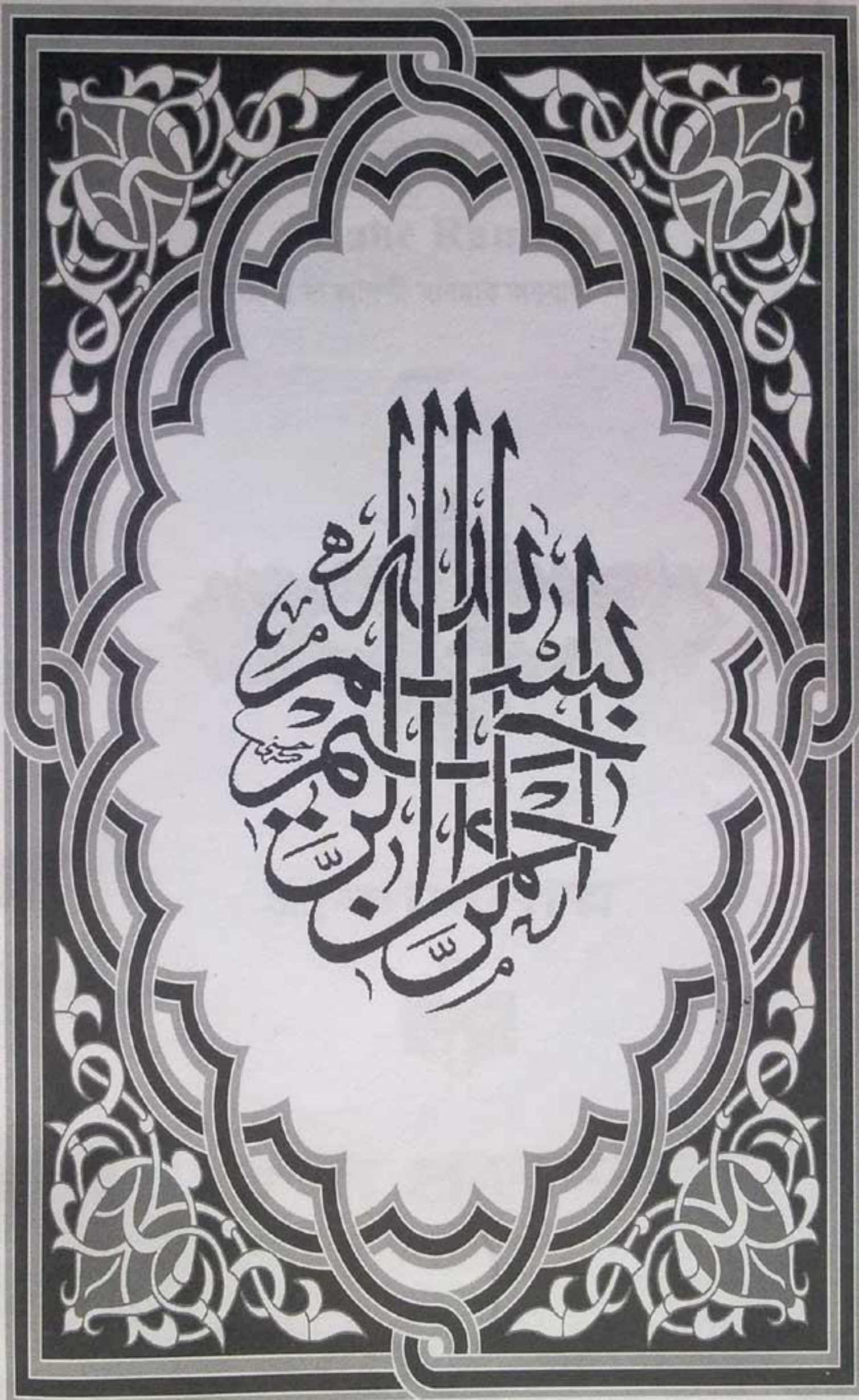
بسم الله الرحمن الرحيم

মাহে রমযান

Mahe Ramzan

(ইমামীয়া বা জাফরী মাযহাব অনুযায়ী সংকলিত)

প্রকাশনায়

রুফা প্রকাশনী

খুলনা।

মাহে রমযান

সংকলন ও অক্ষর বিন্যাস :
মনিরুল ইসলাম সেলিম

সম্পাদনা : হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ রেজা আলী যাইদী

প্রকাশনায় :
রুকাইয়া বিনতে সালিম
রুফা প্রকাশনী
৭৬, বড় বয়রা মেইন রোড,
খুলনা-৯০০০।
☎ ০৪১-২৮৫২৮৩০ ০১৭৪৯৩৩৩৫৮৮

প্রকাশকাল : ২৪শে মহররম, ১৪৩২ হিজরী,
৩১শে ডিসেম্বর, ২০১০ ইং।
মূল্য: ৭০/= (সত্তর) টাকা মাত্র।

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN : 978-984-33-2184-8

Mahe Ramzan

Compiled and Letter ordered by:
Monirul Islam Salim
Editor : **Hujjat al-Islam Syed Rega Ali Zaidi**
Principal, Haoza-e-ilmia Sahebuzzamaan (a.s) Madrasah
Khalishpur, Khulna-9000
Published by: Ruquiya Binta Salim
Rufa Prokashani
76, Baro Boyra Main Road, Khulna-9000.
041-2852830. 01749333588
E-mail: Salimban14@yahoo.com

সূচীপত্র

সংকলকের কথা : ---------- ৭
ভূমিকা : ---------- ১৫
নতুন চাঁদ দেখা : ---------- ১৯
রোযার প্রকারভেদ : ---------- ২৩
রোযা ভঙ্গের অনুমতি গুলো হলো : ---------- ২৮
রোযার নিয়্যত : ---------- ৩২
রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ : ---------- ৩২
সেহ্‌রীর নিয়ম ও দোয়া : ---------- ৩৫
ইফতারের নিয়ম ও সময়সূচী : ---------- ৩৭
রোযাদারকে ইফতার করানো ও দোয়া : ---------- ৩৯
ইফতারের সময়সূচী : ---------- ৪১
রমযানের রাতের নামায : ---------- ৫১
তাহাজ্জুদ নামায : ---------- ৫৩
রমযান মাসের বিশেষ দোয়া : ---------- ৫৫
ক্বদরের রাত : ---------- ৬১
শবে ক্বদরের আমলসমূহ : ---------- ৬৮
ই'তিকাফ : ---------- ৭৬
যাকাত : ---------- ৭৯
খুম্‌স : ---------- ৮২
যাকাতুল ফিত্‌র :---------- ৮৬
ঈদের নামায : ---------- ৯১

সংকলকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

বছর ঘুরে রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের সওগাত নিয়ে আমাদের মাঝে হাজির হয় মাহে রমযান। 'মাহে' শব্দটি ফার্সী যার অর্থ মাস। আর 'রমযান' হচ্ছে আরবী বার মাসের একটি মাসের নাম। চাঁদের আবর্তন দ্বারা আরবী বছরের যে গণনা করা হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আল-কুরআনে সূরা তাওবার ৩৬ নং আয়াতে বলেন, "নিশ্চয় আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি।" আর চন্দ্র বৎসরের বার মাসের মধ্যে শুধুমাত্র নবম মাস রমযানের নাম পবিত্র আল-কুরআনে উল্লেখ আছে। সূরা আল-বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েতস্বরূপ এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ, আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।"

'রোযা' শব্দটি ফার্সী। বাংলা ও উর্দু ভাষায় তা বহুল প্রচলিত। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা বা উপবাস। প্রচলিত 'রোযা' শব্দটিকে আরবীতে বলা হয় 'সাওম'। 'সাওম' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত রাখা। তবে 'রোযা' শব্দটি 'সাওম' এর প্রতিশব্দ নয়। 'রম্‌য' শব্দ হতে রমযানের উৎপত্তি। এর বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'পোড়ানো' বা 'দাহন'। এ দাহন হলো মানব জীবনের কুপ্রবৃত্তির দাহন, যে কুপ্রবৃত্তি মানবাত্মাকে কলুষিত করে আত্মিক উন্নতি সাধনের পথে রোধ হয়ে দাঁড়ায়। আর শরীয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিকের উদয় থেকে রাতের শুরু পর্যন্ত নিয়্যত সহকারে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন ও তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ যা রোযা বাতিল করে তা থেকে বিরত থাকাকেই সাওম বা রোযা বলে। আর 'সিয়াম' শব্দটির অর্থ রোযা রাখা এবং সিয়াম পালনকারী বা রোযাদারকে 'সায়িম' বলে। রমযান মাসকে চন্দ্র বছর হিসাবে গণনা করা হয়। চন্দ্র বছর সৌর বছরের চেয়ে ১০ থেকে ১১ দিন কম হয়। এজন্যে প্রতি বছর রমযান মাস পূর্বের বছরের চেয়ে ১০-১১ দিন এগিয়ে আসে। এতে সুবিধা যে, মুসলমানরা সব ঋতুতেই রোযা পালনের অভিজ্ঞতা লাভ করে।

ক্ষমা ও অনুগ্রহ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ ও সৌভাগ্যের মাস পবিত্র রমযান। আত্মগঠন ও তাকওয়াপূর্ণ জীবনগড়ার সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের মাস মাহে রমযান। মরীচিকাময় পার্থিব জীবনের

(হায়াতুদ্দুনিয়ার) প্রবৃত্তির তাড়নার উপর বিবেক বা বুদ্ধিবৃত্তি এবং ঈমান ও ইচ্ছাশক্তির বিজয় ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার মাস মাহে রমযান। এ মাসে নাফ্স বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধতা অর্জন, আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া) ও আত্ম-উপলব্ধিশক্তি রমযানের রোযা পালনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। মাহে রমযানের শিক্ষা দ্বারা আমরা স্বল্পস্থায়ী পার্থিব জীবনের প্রতিটি মূহূর্তের কর্ম বা আমলকে প্রকৃত জীবনে (পারলৌকিক জীবন) রূপান্তরিত করতে পারি। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ মাসকে 'শাহরুল্লাহ' তথা আল্লাহর মাস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এ মাসে রোযা পালনকারীকে স্বীয় মেহমান-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ্ বলেন, "রোযা আমারই জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেব।" রোযা ছাড়া অন্যান্য যেসব ইবাদত আছে, তা পালন করার জন্য কোন না কোন বাহ্যিক রূপের আশ্রয় নিতে হয় কিন্তু রোযার কথা আল্লাহ এবং রোযাদার ভিন্ন অন্য কেউ জানতে পারে না। আল্লাহকে 'আলীমুল গায়িব' মনে করে কোন রোযাদার ব্যক্তি গোপনে রোযা পালনের বিধান ভঙ্গ করে না। আর রোযা শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, এটা একটি সামাজিক ইবাদত। রোযা আমাদের দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। রোযা রাখার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে ফকির-মিসকিনরা অনাহারে ক্ষুধার্ত অবস্থায় জীবন-যাপন করে। কেন রোযা ওয়াজিব করা হয়েছে? তার প্রত্যুত্তরে হযরত ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) বলেন, "যাতে করে ধনীরা দরিদ্রদের ক্ষুধার্ত অবস্থাকে উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের প্রতি গুরুত্ব দেয়।" [সূত্র : আল কুলাইনী (মৃত্যু-৩২৯ হিঃ), আল-কাফি, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮১]। তাই রোযার বিধান মানুষের ব্যক্তিগত ইবাদতকে সামগ্রিক ইবাদতে পরিণত করে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে রোগ নিরাময়ের যতগুলো প্রতিকার এবং প্রতিষেধক আছে রোযা তার মধ্যে একটি শক্তিশালী মাধ্যম। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক ইবনে সিনা তার রোগীদের তিন সপ্তাহের জন্য উপবাস পালনের বিধান দিতেন। রোযা উর্ধ্ব রক্তচাপজনিত ব্যাধিসহ অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিসমূহ নিরাময়ে সাহায্য করে।

একমাস সিয়াম সাধনার পর এক অনাবিল আনন্দ ও খুশীর বার্তা নিয়ে আসে 'ঈদুল ফিতর'। 'ঈদ' অর্থ আনন্দ। রোযাদারদের জন্য পরম পুরস্কার প্রাপ্তির অনুষ্ঠানের নাম ঈদ। প্রকৃত ঈদের আনন্দ ঐ সকল নর-নারীদের জন্য যারা আল্লাহর দেয়া নিয়ামত রমযানুল মোবারক থেকে রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পেরেছে।

ঈদের আগমনে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে উপহার ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে। ঈদের নামাযের পর নিজেদের মধ্যে মোলাকাত, দেখা-সাক্ষাৎ করে। আত্মীয় বান্ধবের বাড়ীতে যায়। তাই ঈদের আগমন মুসলিম বিশ্বকে এক নতুন আনন্দদোলায় আন্দোলিত করে। এ ধরনের একটি অনাবিল আনন্দানুষ্ঠান

পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে মুসলমানদের মাঝে রোযার ইবাদতের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা না থাকার জন্য, রমযানের পর থেকে নেকী আর পরহেযগারীর পবিত্র উজ্জ্বল ভাবধারার সকল প্রভাব একবারে বিলুপ্ত হতে থাকে, যা একজন মুসলমানের এক মাসকাল ঈমানের ধারাবাহিক পরীক্ষার ব্যর্থতা বলে গণ্য করা যায়। এ জন্য আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করতে পারি, "হে আল্লাহ! রোযার পরও আমি যেন সংযমী, সুন্দর ও কল্যাণকর জীবন যাপন করতে পারি এবং নিজেকে তোমার দ্বীনের সকল কাজে নিবেদিত করতে পারি সে তৌফিক আমাকে দান কর।"

রমযান মাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিন ও রাত আছে। তারমধ্য ২১শে রমযান হযরত ইমাম আলী (আঃ)-এর শাহাদাত দিবস; ১৫ রমযান হযরত ইমাম হাসান (আঃ) এর জন্ম দিবস; ১৭ই রমযান বদর যুদ্ধ; ১৯, ২১, ২৩শে রাত ক্বদরের রাত; রমযান মাসের শেষ শুক্রবার হচ্ছে 'বিশ্ব আল-কুদস দিবস'; মাহে রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে ই'তিকাফ এবং একমাস সিয়াম সাধনার পর খুশীর বার্তা নিয়ে আসে 'ঈদুল ফিতর'। নিম্নে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হলো।

হযরত ইমাম আলী (আঃ) এর শাহাদাত দিবস :

১৯শে রমযান, ৪০ হিজরী খারেজী সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রে অভিশপ্ত গুপ্তঘাতক আব্দুর রহমান ইবনে মূলজিম বিষ মাখানো তরবারী দ্বারা হযরত ইমাম আলী (আঃ)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর মাথায় আঘাত করে। ইমাম আলী (আঃ) সে সময় ইরাকের কুফার মসজিদে ফযরের নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সত্যের মেহরাব রক্তে রঞ্জিত হয়। অতঃপর ইমাম (আঃ)-কে রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় গৃহে নিয়ে আসা হয়। ২১শে রমযান মধ্যরাতের দিকে ৬৩ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ইসলামের একটি সফল অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটে। হযরত ইমাম আলী (আঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় হচ্ছেঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৩ বছর, আর নিজ ইমামত কাল ৩০ বছর। এ ৩০ বছরের মধ্যে খেলাফত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন প্রায় ২৫ বছর এবং নিজের খেলাফতকাল ছিল ৪ বছর ৯ মাস। ইমাম আলী (আঃ) তাঁর খেলাফতকালকে একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন, যার ধারাবাহিকতা আহ্‌লে বাইতের পরবর্তী ইমাম (আঃ) গণ অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।

হযরত ইমাম আলীর (আলাইহিমুস সালাম-তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে তাঁর শাহাদাতের শেষ মুহূর্তগুলো। এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে দু'দিন দু'রাত অর্থাৎ প্রায় ৪৫ ঘন্টার জীবন এবং এ অধ্যায়টি ছিল তাঁর মাথায় জখমপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর শাহাদাতবরণ এর মধ্যবর্তী সময়। অভিশপ্ত গুপ্তঘাতক আব্দুর রহমান ইবনে

মূলজিম যখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা ইমাম আলী (আঃ) এর মাথায় আঘাত হানলো তখন তিনি দু'টি সংক্ষিপ্ত উক্তি করেন। তার একটি ছিল, "এ লোকটিকে গ্রেফতার করো।" এবং অন্য বাক্যটি ছিল, "ফুযতু বি রব্বিল ক্বাবা।" অর্থাৎ "খানা-এ-ক্বাবার প্রভুর শপথ আমি বিজয়ী হয়েছি।"

২১শে রমযান মধ্যরাতে হযরত ইমাম আলী (আঃ) এর জীবনের শেষ মুহূর্তের দৃশ্যটি হচ্ছে- তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, প্রতি মুহূর্তে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটছে, বিষ তাঁর পবিত্র শরীরে প্রতিক্রিয়া করছে। তাঁর সঙ্গীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, সবাই ক্রন্দনরত, চারিদিকে ক্রন্দনের শব্দ, কিন্তু ইমাম আলী (আঃ)-এর মুখ হাস্যোজ্জ্বল। তিনি একে একে তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র বা উইল, হেকমতপূর্ণ উপদেশ ও নসিহত বর্ণনা করছিলেন। সবশেষ কথাগুলি বললেন, "আল্লাহ, আল্লাহ, ইয়াতীমদের ব্যাপারে সর্তক থেকো; আল্লাহ, আল্লাহ, কুরআনকে আঁকড়ে ধরো; আল্লাহ, আল্লাহ, প্রতিবেশীদের ব্যাপারে দায়িত্বের কথা মনে রেখো; নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত - - - ।" সবাই হযরত ইমাম আলী (আঃ)-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন ইমাম আলী (আঃ)-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। সবাই কান পেতে আছে তিনি আর কি বলেন। সবাই দেখছেন ইমাম আলী (আঃ) উচ্চঃস্বরে পড়ছেন, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্।" বলার মুহূর্তে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র নিকট তাঁর পবিত্র আত্মার প্রত্যাবর্তন ঘটলো। "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন-নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।" (সূত্র : বিহারুল আনওয়ার, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৪৬; নাহ্জুল বালাগাহ্, পত্র নং-৪৭)।

হযরত ইমাম হাসান (আঃ) ও হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ) কর্তৃক ইমাম আলী (আঃ) এর গোসল, কাফন ও দাফন সম্পন্নের পর ইমাম (আঃ)-কে তাঁর ওসিয়াত অনুসারে নাজাফ-এ-আশরাফ, ইরাকে, বর্তমানে যে স্থানে তাঁর পবিত্র রওজা মুবারক রয়েছে সেখানে গোপনে কবরস্থ করেন, যাতে করে শত্রুদের প্রতিহিংসা ও ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর কবর নিরাপদে থাকে। পরবর্তীতে ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) ও সপ্তম ইমাম মুসা কাযিম (আঃ) তাঁর পবিত্র কবরের সন্ধানটি তাঁদের অনুসারীদের নিকট প্রকাশ করেন।

আমিরুল মু'মিনিন হযরত ইমাম আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ) ছিলেন সত্যের এক মহান নিদর্শন এবং মহৎ গুণাবলীর প্রতীক। তাঁকে ভালবাসার মূলে রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর নবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক। ইমাম আলী (আঃ) ছিলেন সর্বদা আল-কুরআনের সাথে, আর আল-কুরআন ছিলো তাঁর সাথে। তাঁর প্রতি ভালবাসার ভিত্তি হচ্ছে সত্যের সাথে আমাদের অন্তরের সম্পর্ক। হযরত ইমাম আলী (আঃ) এর বন্ধুরা ছিল সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ এবং তাঁকে তারা নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসত। আমাদের দরকার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এ সত্যকে দেখা এবং সত্যকে নিরূপন করে তাঁর অনুসরণ করা।

হযরত ইমাম হাসান (আঃ) এর পবিত্র জন্ম দিবস :

রমযান মাসের অন্যান্য ফজিলতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত হচ্ছে- তৃতীয় হিজরী সনের রমযান মাসের ১৫ তারিখ মঙ্গলবার মদীনা শরীফে মহানবী (সাঃ)-এর দৌহিত্র ইমাম আলী (আঃ) ও হযরত ফাতিমা (সাঃ আঃ)-এর প্রথম সন্তান, জান্নাতের সরদার ইমাম হাসান (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এ দিনটি প্রত্যেক মুসলমানের কাছে অত্যন্ত আনন্দের দিন। বিশেষ করে ইমামীয়া মাযহাবীদের জন্য আরো বেশী আনন্দের। কারণ তাদের দ্বিতীয় ইমাম হাসান (আঃ) এ দিনে দুনিয়াতে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় ইমাম হাসান (আঃ)-এর বয়স ছিল সাত বছর।

ইমাম হাসান (আঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি হাদীস হচ্ছে- একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর ঘরে গেলেন। বললেন, "এখানে খোকা আছে, খোকা আছে, অর্থাৎ হাসান। আমরা ধারণা করলাম যে, তাঁর মা তাঁকে আটকিয়ে রেখেছেন গোসল করানোর জন্য। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসান দৌড়ে চলে এলেন এবং তাঁরা [রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং হাসান] একে অপরকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "ইয়া আল্লাহ! আমি তাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসো, আর ভালবাসো ঐ লোককে, যে তাকে ভালবাসে।" (সূত্র : মুসলিম শরীফ, ইফাবা, ষষ্ঠ খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-৬০৩৯, পৃষ্ঠা-৪১৩)।

হযরত বারা' (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখলাম, হাসান ইবনে আলীকে তাঁর কাঁধে বসিয়ে রেখেছেন। তিনি বলছেন, "হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসো।" (সূত্র : মুসলিম শরীফ, ইফাবা, ষষ্ঠ খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-৬০৪১, পৃষ্ঠা-৪১৪)।

হযরত আবূ বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি, ঐ সময় হাসান (রাঃ) তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার উপস্থিত লোকেদের দিকে আবার হাসান (রাঃ)-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, "আমার এ সন্তান সাইয়্যেদ (নেতা)।" (সূত্র : বুখারী শরীফ, ইফাবা, ষষ্ঠ খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-৩৪৭৪, পৃষ্ঠা-৩২৫)।

মাহে রমযানের এ দিনে আমাদের শপথ হোক ইমাম হাসান (আঃ)-এর একজন প্রকৃত অনুসারী হিসেবে নিজেকে গড়ার। ইমাম হাসান (আঃ) এর প্রকৃত অনুসারী হওয়া সম্পর্কে ইমাম হাসান (আঃ)-এর একটি হাদীস হচ্ছে-

ওয়াররাম ইবনে আবী ফারাস স্বীয় গ্রন্থ 'তানবিহুল খাওয়াতির'-এ বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি ইমাম হাসানের (আঃ) নিকট এসে বললঃ "হে রাসূলের (সাঃ) সন্তান! আমি আপনার অনুসারীদের একজন।" ইমাম (আঃ) তার জবাবে বললেন: "হে আল্লাহর বান্দা! যদি তুমি আমাদের নির্দেশের উপর

আমলকারী হয়ে থাক তাহলে সত্য বলেছ আর যদি তার বিপরীত আমল করে থাক তাহলে অযথা নিজের পাপের বোঝা বৃদ্ধি করো না। কারণ, তুমি যা দাবী করছো তা অনেক উচ্চমানের ও অনেক সম্মানের, যার উপযুক্ত ও যোগ্য তুমি নও। এটা বলো না যে, আমি আপনার অনুসারী বরং বলঃ আমি আপনার বন্ধু ও আপনার সাথে সম্পৃক্তদের মধ্যে একজন, আপনার শত্রুদের শত্রু। এমতাবস্থায় তোমার অবস্থান হবে উত্তমদের মাঝে।" (জেন্দেগানীয়ে ইমাম হাসান মুজতাবা, সৈয়দ হাশেম রাসূলি মাহাল্লাতি, পৃষ্ঠা-৩৪১)।

বদর যুদ্ধ :

২য় হিজরীর ৮ই রমযান সোমবার, মহানবী (সাঃ) তিনশত তের জন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে 'বদর' অভিযানের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। 'বদর' প্রান্তর হচ্ছে, মদীনা থেকে ৮০ মাইল দূরে সিরিয়ার পথে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান। এখানে 'বদর যুদ্ধ' সংঘঠিত হয়েছিল ১৭ই রমযান জুমু'আর দিন সকাল বেলা মুতাবিক ১৩ই মার্চ, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে। [সূত্র : সীরাতুন নবী (সাঃ), ইবনে হিশাম, ইফাবা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩০৩ এবং ৩১৪]।

বিশ্ব আল-কুদস দিবস :

রমযান মাসের শেষ শুক্রবার হচ্ছে 'বিশ্ব আল-কুদস দিবস'। ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের পর (১৯৭৯ সালে) বিপ্লবের নেতা ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ)-এর নির্দেশে রমযানের শেষ শুক্রবারকে 'বিশ্ব আল-কুদস্ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে থেকে প্রতি বছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ গুরুত্বের সাথে এ দিবস পালিত হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তারা 'বিশ্ব আল-কুদস দিবস' পালন করার আহবান জানিয়ে বিশ্ব মুসলিমকে সচেতন ও সজাগ করার ভূমিকা পালন করছেন। ইরান সরকার অসহায় ফিলিস্তিনীদের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে। 'আল-কুদস দিবস' এখন শুধু ফিলিস্তিনীদের দিবস নয়, এটা এখন বিশ্বে ইসলামের একটি দিবস হিসেবে গণ্য হয়েছে। আমরা জানি, বিশ্ব মানবতার চরম দূর্দিনে নিপীড়িত মজলুম জনগোষ্ঠীর জন্য শান্তির সওগাত নিয়ে এসেছিল পবিত্র ধর্ম ইসলাম। কিন্তু ইসলামের সুমহান শিক্ষা থেকে বিচ্যুতি মুসলমানদেরকে আজ ঠেলে দিয়েছে অশান্তির দাবানলে।

উল্লেখ্য যে, ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত 'বায়তুল মোকাদ্দাস' বা 'মসজিদুল আকসা' মুসলমানদের প্রথম কেবলা। "আল্লাহ এক রাত্রে মহানবী

(সাঃ)-কে স্বশরীরে মসজিদুল হারাম (মক্কা) থেকে মসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করান। তারপর 'মসজিদুল আকসা' থেকে মহানবী (সাঃ) স্বশরীরে মিরাজে (উর্ধ্বদিগন্তে) গমন করেন।" (সূত্র : সূরা বনী ইস্‌রাঈল, আয়াত নং-১) এবং মহানবী (সাঃ) 'আরশ', 'কুরসী', এবং 'সিদরাতুল মুনতাহা' নামক জায়গায় পবিত্র পর্দা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। "মহানবী (সাঃ) আল্লাহর অতিনিকটবর্তী হন। ফলে তাঁদের মধ্যে দু'ই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা তারও কম।" (সূত্র : সূরা নাজ্‌ম, আয়াত নং ৮-৯)। এ কুদস এলাকায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মস্থান। 'বায়তুল মোকাদ্দাস' ছিল হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাইল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত সুলাইমান এবং হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট ওহী নাযিলের স্থান। ইতিহাসের ক্রমধারায় বিভিন্ন সময়ে এ স্থানটি চরমপন্থী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের শিকার হয়। বর্তমানে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর সহায়তায় যায়নবাদী ইহুদী ইসরাইল ফিলিস্তিনী ভূখন্ডে যে অত্যাচার ও নৃশংসতার তান্ডবলীলা চালাচ্ছে তা বিশ্ববাসীর অজানা নেই। মানবতার এ ক্রান্তিলগ্নে বিশ্বের সকল ন্যায়পরায়ণ ও মুক্তিকামী মজলুম মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে ফিলিস্তিনীদের সাহায্য ও সহযোগিতায়।

'মাহে রমযান' বইটি লিখিত হয়েছে 'ইমামীয়া বা জাফরী মাযহাব' এর ফিকাহ অনুযায়ী। আর এ মাযহাবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রত্যেক মারজা'র মুকাল্লিদবৃন্দ স্ব স্ব মারজা'র ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে থাকেন। এখানে শুধুমাত্র মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু সূত্র আমাদের দেশে পরিচিত সুন্নী মতালম্বীদের কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে। আমাদের সুন্নী মতালম্বী ভাইয়েরা যেভাবে চারটি মাযহাবে (হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী) বিভক্ত হয়েও তাদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব বলে মনে করেন, ঠিক তদ্রুপ চার মাযাহাবের স্থলে পাঁচ মাযহাব হলেও ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কোন বাধা নেই বলে আমরা মনে করি। মিশরের সুবিখ্যাত আল-আযহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী ফিকাহর পাশাপাশি 'ইমামীয়া বা জাফরী মাযহাব' এর ফিকাহও পড়ানো হয়। তাছাড়া ১৯৮৮ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ ফিকাহ সম্মেলনে চল্লিশটি দেশের ফকীহবৃন্দের উপস্থিতিতে 'ইমামীয়া বা জাফরী মাযহাব'-কে সুন্নী মাযহাবসমূহের ন্যায় একটি গ্রহণযোগ্য মাযহাব হিসেবে স্বীকৃত দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, রাহবার আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী- আল্লাহ তাকে দীর্ঘ জীবনদান করুন)-এর নির্দেশে এবং তাঁর পছন্দকৃত নাম অনুযায়ী ইরানের গুলিস্তান প্রদেশের গোরখান শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আল্-মুস্তাফা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়' এর একটি শাখা 'রাসূলে আকরাম (সাঃ)' শিক্ষা বিভাগ। এ প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ সরকারী খরচে বিদেশী সুন্নী মতালম্বী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে নিজ আকীদা বা বিশ্বাসকে

অক্ষুন রেখে তারা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তা ছাড়া ইরানে সুন্নী মাযহাবীদের অসংখ্য নিজস্ব মাদ্‌রাসাহ্ রয়েছে। কাজেই মুসলমানরা বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত হওয়ার পরও সম্মিলিতভাবে ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করতে পারে। একে অপরের নিকট থেকে সঠিক তথ্যের আদান-প্রদান ও জ্ঞান বিনিময় করতে পারে। আর এটাই হল সকলের ঈমানী দায়িত্ব এবং সময়ের দাবীও বটে। এখানে 'ইমামীয়া বা জাফরী মাযহাব' বলতে 'ইসনা আশারিয়া বা 'আহ্‌লে বাইত' এর ধারায় বার ইমামের অনুসারীদের মাযহাবকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হাদীস লিপিবদ্ধ করণের উপর হতে রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর দলে দলে লোক মহানবীর (সাঃ) হাদীস সংগ্রহের জন্য ৬ষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সাদিক (আঃ) এর শরাণাপন্ন হয়। ইমাম (আঃ) তখন হাদীস প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ভূমিকা রেখেছিলেন বলে আহলে বাইত (আঃ) এর মাযহাব 'জাফরী মাযহাব' নামে পরিচিতি লাভ করে।

মাহে রমযান এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের প্রকাশকে লক্ষ্য করে 'মাহে রমযান' বইটি প্রকাশ করার চিন্তা করি। আমাদের সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য সীমাবদ্ধ। তবুও সাধ্যের মধ্যে সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে নিজস্ব প্রকৃতি ও ছন্দে-অতীতের প্রশংসা বা নিন্দা, আনুকূল্য বা বাধা, ব্যর্থতা বা সাফল্য থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই সামনের দিকে। এ বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং সাধারণ পাঠকদের ক্রয় ক্ষমতার কথা চিন্তা করে বইয়ের কিছু অধ্যায়কে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। পাঠকসমাজ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাদের প্রকাশিত বই ক্রয়ের উৎসাহ পেলে, পরবর্তীতে বইয়ের পৃষ্ঠার কলেবর বৃদ্ধি এবং নুতন নুতন বিষয়ে বই প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। এ বইটিতে লিখিত বিভিন্ন দোয়াগুলির অডিও কণ্ঠ আমরা পেতে পারি **www.duas.org** ওয়েব সাইট থেকে। বইটি প্রিয় পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার পর্যায়ে আসা পর্যন্ত আমরা অনেকের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে বইটি সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন বিশিষ্ট গুণীজন ও শিক্ষক হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ রেজা আলী যাইদী। অধ্যক্ষ, হাওজা-ই ইলমীয়া সাহেবুজ্জামান (আঃ) মাদ্‌রাসাহ্, খালিশপুর, খুলনা-৯০০০। তাদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও চেষ্টা করেছি মাহে রমযানের উপর একটি সুন্দর বই উপহার দেয়ার। তারপরও কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সেজন্য সকলের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কাম্য। জ্ঞানী পাঠকদের সমীপে সবিনয় নিবেদন, যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের সন্ধানী দৃষ্টি গোচর হয় তাহলে আমাদের জানালে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকবো। পরবর্তী সংস্করণের জন্য আপনাদের সুচিন্তিত ও নির্ভরযোগ্য পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। যোগাযোগের জন্য ডাক মাধ্যম ছাড়াও ০১৭১৫-০৪২৬৫৭ নম্বর মোবাইলে সরাসরি পরামর্শ জানানোর জন্য অনুরোধ রইল। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকল পবিত্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমিন-ইয়া রব্বাল আ'লামিন।

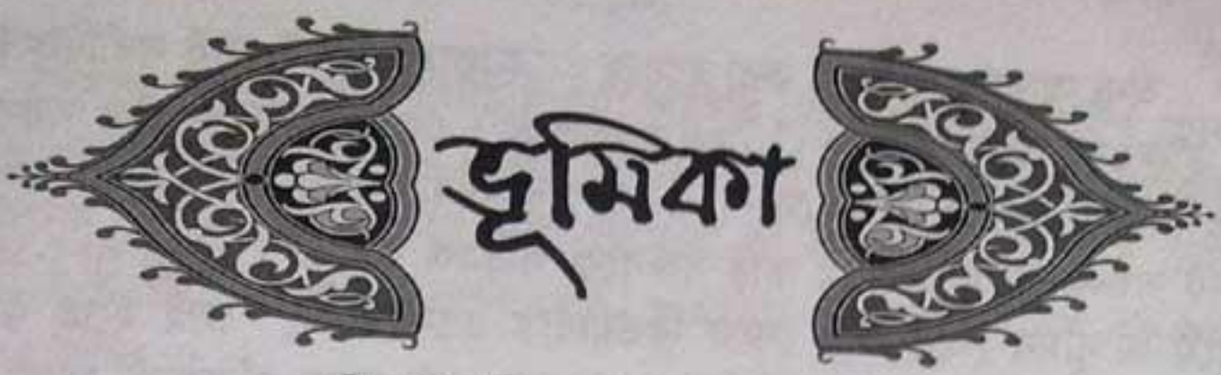

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।
পরম করুণাময় অনন্ত দাতা আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

ইসলামের শাখা-প্রশাখা (ফুরুয়ে দ্বীন) এর বিভিন্ন স্তর ও পরিধির মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ (রুকন) হচ্ছে রমযান মাসের রোযা। নামাযের পরই রোযার স্থান। হিজরতের দ্বিতীয় বছরে রমযানের রোযা 'ওয়াজিব' (বাধ্যতামূলক)[১] করা হয়। রমযান মাসে রোযা রাখা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) লোকের জন্যই ওয়াজিব। তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক (নাবালেগ) যদি ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে তাহলে সে রোযা রাখলে তা সহীহ হবে। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষকে শরীয়তের পরিভাষায় মুকাল্লিফ বলে।

রোযার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়ার গুণ অর্জন বা মুত্তাকী হওয়া। এ সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলা'মিন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

(ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুছ-ছিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বলিকুম লা'আল্লাকুম তাত্তাকুন।)
"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের উপর রোযা ওয়াজিব করেছি যেমন ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ওয়াজিব করা হয়েছিল যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা আল-বাকারা-১৮৩)।

১। ইসলামে যে সব কাজ অপরিহার্যভাবে করণীয়, না করলে আল্লাহর নিকট শাস্তি যোগ্য অপরাধ, সে সব কাজ বোঝাতে আরবী ভাষায় প্রধানত 'ওয়াজিব' বলা হয়। আমাদের দেশে একই অর্থে প্রধানত 'ফরয' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে : "আল্লাহর নিকট সেই সর্বাধিক প্রিয় যে তাকওয়া অর্জন করেছে।" (সূরা হুজরাত-৩)। রোযা মানুষকে তার নফসের প্রতি বিজয়ী হওয়ার শিক্ষা দেয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে: "সেই সফলকাম হয়েছে যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে।" (সূরা আলা-১৪)। এমর্মে মা'সুমিন (আঃ)-গণ থেকে রিওয়ায়াত এসেছে যে, "সেই হচ্ছে উত্তম ব্যক্তি যে তার নফসের সাথে জিহাদ করে এবং সেই হচ্ছে শক্তিশালী মানুষ যে তার নফসের উপর বিজয়ী হয়।" [আত্-তাবারসী (মৃত্যু- ১৩২০ হিঃ), মুসতাদরাক আল-ওয়াসায়েল, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০২]। হযরত ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন, "নফসের রোযা দুনিয়ার সুখ-শান্তি অপেক্ষা অধিকতর মুনাফা সম্পন্ন রোযা"। [আল-আমাদি (মৃত্যু- ৫৫০ হিঃ), গুরারুল হিকাম, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১৬, হাদীস-৬৪]।

উল্লেখ্য মনুষ্যজীবনের দু'টি দিক রয়েছে, এক-দৈহিক, দুই-আত্মিক। একজন রোযাদার এ মাসে আল্লাহর আদেশে আত্মিক একাগ্রতা ও দৈহিক ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জন করে। তাই রমযান মাস হচ্ছে আধ্যাত্মিক চর্চার এবং স্বীয় সত্তার হারিয়ে যাওয়া পবিত্রতাকে পুনরায় অর্জন করার উত্তম ও উপযুক্ত মাস।

হাদীসে কুদ্সীতে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ বলেন, রোযা শুধু আমার জন্য নিবেদিত এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।" [আল্লামা মাজলিসী (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহ্-আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) মৃত্যু : ১১১১হিঃ, বিহারুল আনওয়ার, ৯৬তম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫৮]।

হযরত ইমাম আলী ইবনে আবি তালেব (আঃ) বলেন : "তোমাদের জন্য মাহে রমযানে বেশী বেশী ইস্তিগফার ও দোয়া করা কর্তব্য। তোমাদের দোয়া ও মোনাজাতের দ্বারা তোমাদের বালা-মুছিবত দূর হয়ে যাবে। আর তোমাদের ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা তোমাদের গোনাহ্-খাতা মাফ হয়ে যাবে।" [শেখ সাদুক (মৃত্যু- ৩৮১ হিঃ), আল-আমালী, পৃষ্ঠা-৬১]।

এ মাস সম্পর্কিত এক বিশেষ খুতবায় মহানবী (সাঃ) বলেন, "হে মানব সকল! রহমত, বরকত ও মাগফিরাত সাথে নিয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের প্রিয় মাস তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর কাছে এই মাসটি অন্যান্য সকল মাসের থেকে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। এ মাসের দিনগুলো অন্যান্য দিনগুলোর, রাতগুলো অন্যান্য রাতগুলোর এবং প্রতিটি ক্ষণ অন্যান্য সকল ক্ষণের থেকে অধিক ফযিলতমন্ডিত।" [শেইখ সাদুক (মৃত্যু- ৩৮১ হিঃ), উয়ুন্ আখবার আর রিদ্বা (আঃ), বৈরুত প্রিন্ট, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৬, হাদীস নং-৫৩]।

রমযান মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "যদি আল্লাহর বান্দা জানতো যে রমযান মাস কি (ও তাতে কি বরকত রয়েছে) তবে সম্পূর্ণ বছরটি রমযান মাস হওয়াটা তার কাছে আনন্দদায়ক হত।" [আল্লামা মাজলিসি (মৃত্যু- ১১১১হিঃ), বিহারুল আনওয়ার, খন্ড-৯৩, পৃষ্ঠা-৩৪৬]।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি- আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর ও তাঁর আহ্‌লে বাইত এর ওপর) বলেন : "মাহে রমযানের প্রথম রাত্রিতে আসমানের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং তা ঐ মাসের শেষ রাত্রি পর্যন্ত উন্মোচিত থাকে।" [আল্লামা মাজলিসি (মৃত্যু- ১১১১হিঃ), বিহারুল আন্‌ওয়ার, খন্ড-৯৬, পৃষ্ঠা-৩৪, হাদিস নং ৮]।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : "মাহে রমযানের চাঁদ উদয় হওয়া মাত্র দোজখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয় আর শয়তানদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।" (সূত্র : আল্লামা মাজলিসি, বিহারুল আন্‌ওয়ার, খন্ড- ৯৬, পৃষ্ঠা-৩৪৮, হাদিস নং ১৪; বুখারী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, হাদীস নং -১৭৭৮, পৃষ্ঠা-২৪১)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : "জান্নাতে 'রাইয়্যান' নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।" (সূত্র : বুখারী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, হাদীস নং -১৭৭৫, পৃষ্ঠা-২৪০; ওয়সায়েলুশ শিয়া, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯৫, হাদীস-৩১)।

হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা (সালামুল্লাহ আলাইহা-তাঁর প্রতি আল্লাহর সালাম বর্ষিত হোক) বলেছেন, "রোযাদার ব্যক্তি যদি রোযা রেখে নিজের জিহ্‌বা, কর্ণ, চক্ষু ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সংযত না রাখে (প্রবৃত্তির তাড়না হতে হেফাজত না করে) তবে তার রোযা কোন সুফল বয়ে আনবে না।" [আল্লামা মাজলিসি (মৃত্যু- ১১১১হিঃ), বিহারুল আনওয়ার, খন্ড-৯৩, পৃষ্ঠা-২৯৫]।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেছেন, "যখন রোযা রাখবে তখন অব্যশই তোমার চক্ষু,কর্ণ, চুল, চামড়াও যেন রোযা রাখে (অর্থাৎ গোনাহ্‌ থেকে দূরে থাকবে)"। [আল-কুলাইনী (মৃত্যু- ৩২৯), আল-কাফি, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৭, হাদীস-১]।

চতুর্থ ইমাম হযরত সাজ্জাদ (আঃ) 'সাহিফায়ে সাজ্জাদিয়া'-তে রমযান মাসের বিদায় নামক দোয়াতে বলেন, "হে আল্লাহ্‌ তুমিই রমযান মাসকে শ্রেষ্ঠতম দায়িত্ব ও বিশেষ আমলসমূহকে নির্দিষ্ট করেছো। সেই রমযান মাসকে তুমি অন্যান্য সকল মাসের থেকে আলাদা এবং সকল দিন ও ক্ষণ থেকে উৎকৃষ্ট করেছো। সাথে সাথে বছরের সকল মুহূর্ত থেকে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছো। কেননা, তুমি তাতে পবিত্র কুরআন অর্থাৎ নূরকে নাযিল করেছো এবং ইবাদতের জন্য দন্ডায়মান হতে বলেছো। সাথে সাথে এ মাসে শবে ক্বদরকে নির্দিষ্ট করেছো, যে রাত হচ্ছে হাজার মাসের থেকেও উত্তম ও উৎকৃষ্ট - - - -।" (সূত্র : সাহিফায়ে সাজ্জাদিয়াহ্‌, দোয়া নং-৪৫)।

রমযান মাসে উত্তম আমল হচ্ছে অত্যধিক দানশীলতার পরিচয় দেয়া। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও গভীর আবেগ-উদ্দীপনা সহকারে তাঁর পথে যতবেশী দানশীলতার পরিচয় দেয়া যাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিদানও তত বেশী ধার্য্য হবে এ মাহে রমযানে। রোযার মাসে ধারাবাহিকভাবে রোযা পালনের মাধ্যমে আমরা রোযার ক্ষুধার অভিজ্ঞতা লাভ করে গরীব ও দরিদ্র মানুষের কষ্ট বুঝতে পারি। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যান্য লোকদের তুলনায় অত্যধিক দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। রমযান মাসে যখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি অত্যধিক দানশীল হয়ে যেতেন। আর জিবরাঈল (আঃ) রমযানের প্রত্যেক রাত্রে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। যখন জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ (সাঃ)] প্রবাহমান বায়ু অপেক্ষাও অত্যধিক দানশীল হতেন।" (সূত্র : সুনানু নাসাঈ শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ, হাদীস নং-২০৯৯, পৃষ্ঠা-৪০)।

রমযান মাসে দিনে ও রাতে সর্বোত্তম আমলগুলির মধ্যে একটি উত্তম আমল হচ্ছে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা। যদিও কুরআন তেলাওয়াত করা সবসময়ই সওয়াবের কাজ। কিন্তু কুরআন মজীদ যেহেতু রমযান মাসে নাযিল হয়েছে সেহেতু এ মাসে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত ও অর্থ বুঝে পড়ার বিশেষ গুরুত্ব ও সওয়াব রয়েছে। হাদীসে এসেছে- "যদি কেউ এ মাসে কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করে তার সওয়াব অন্য মাসে পুরো এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করার সমান।"

পরিশেষে বলা যায়, রোযা একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) ইবাদত। নামাযের পরই রোযার স্থান। আমরা যদি সঠিকভাবে ও মনোযোগ সহকারে রোযার হক আদায় করি তাহলে রোযা আমাদের রূহকে পবিত্র ও অন্তরকে আলোকিত (নূরানী) এবং আধ্যাত্মিক শক্তিকে বলীয়ান করে দিবে। যার ফলে পরবর্তীতে রোযা আমাদের সকল অপছন্দনীয় অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে শক্তি দিবে। তাই আমাদের প্রয়োজন রোযা পালনে সঠিক নিয়ম অনুযায়ী আমল করা। রোযাদার হিসেবে নিজেকে পুরোপুরি সকলপ্রকার হারাম দৃষ্টিপাত, লোভ-লালসা, গীবত ও পরচর্চা, অহংকার ও হিংসা এবং সবরকম ঝগড়া-ফ্যাসাদ, বিতর্ক ও উত্তেজনা, চীৎকার ও চ্যাঁচামেচি থেকে দূরে রাখা। শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন- লজ্জা স্থান, চোখ-কান, যবান বা জিহবা, হাত-পা ইত্যাদি-কে সকল প্রকার গোনাহ থেকে হেফাজত করা।

নতুন চাঁদ দেখা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা পালন করো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতারও করো না। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।" (মুসলিম শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ইফাবা), তৃতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-২৩৬৫, পৃষ্ঠা-৪০২; মুয়াত্তা, ইমাম মালিক (রঃ), ইফাবা, প্রথম খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, রোযা অধ্যায়, হাদীস নং-৩, পৃষ্ঠা-৩৫৬; বুখারী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, হাদীস নং-১৭৭৯, পৃষ্ঠা-২৪১)।

(১) চাঁদ দেখে আরবী মাসের প্রথম এবং শেষ তারিখ নির্ধারণের শর্ত :

শ্রদ্ধেয় ফকীহগণ তাদের রিসালাহ্ কিতাবসমূহে আরবী মাসের প্রথম এবং শেষ দিন নির্ণয় এর পাঁচটি পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। তা হলো-

(ক) মাসের শুরু এবং শেষ প্রমাণিত হয় স্বয়ং মুকাল্লাফ (অর্থাৎ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্কব্যক্তি) ব্যক্তির চাঁদ দেখার উপর। যে ব্যক্তি নিজে নতুন চাঁদ দেখেছে সে তার নিজের জানার ভিত্তিতে আমল করতে বাধ্য।

(খ) কিম্বা দু'জন আদেল (ন্যায়পরায়ণ) ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা। এ ক্ষেত্রে আকাশ পরিস্কার থাকুক বা মেঘলা থাকুক এবং তারা একই শহরের অধিবাসী বা কাছাকাছি দুই শহরের অধিবাসী হোন, তাতে কোন পার্থক্য নেই। তবে শর্ত হচ্ছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে তাদের বর্ণনা পরস্পর বিরোধী হবে না। এ ক্ষেত্রে নারী, শিশু, ফাসেক লোক ও যাদের চরিত্র সম্পর্কে জানা নেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

(গ) অথবা এমনভাবে নতুন চাঁদ দেখা প্রচার হওয়া যা থেকে বিশ্বাস অর্জিত হয় যে মাসের প্রথম চাঁদ উঠেছে। নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে এত বেশী লোক সাক্ষ্য দেয় যে, যাদেরকে একত্রে মিথ্যা দাবীদার বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

(ঘ) অথবা পূর্ববতী মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হওয়া।

(ঙ) কিম্বা 'ওলী-এ-ফকীহ' বা 'বেলায়াতে ফকীহ' দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তির হুকুম জারীর মাধ্যমে।

(২) যদি 'ওলী-এ-ফকীহ' এর হুকুম গোটা দেশ অন্তর্ভূক্ত থাকে তাহলে প্রথমা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়া সম্পকির্ত তাঁর হুকুমটি শারয়ীভাবে দেশের সকল শহরে জারী হবে। [রাহবার আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী) ফতোয়া সংকলন আজবেবাতুল ইস্তিফতাআত, ১ম খন্ড, ৮৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর]।

(৩) ধর্মীয় নেতা (ওলী-এ-ফকীহ) যদি প্রথমার চাঁদ দৃষ্ট হওয়া মর্মে হুকুম জারী করেন তাহলেও তার হুকুম শরীয়তসম্মত ও হুজ্জত হবে এবং তা মান্য করা সর্বসাধারণ মুকাল্লীফের জন্য ওয়াজিব। [রাহবার আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী) ফতোয়া সংকলন আজবেবাতুল ইস্তিফতাআত, ১ম খন্ড, ৮৬০ নং প্রশ্নের উত্তর]।

(৪) যদি কোনো শহরে প্রথমার চাঁদ দেখা না যায় কিন্তু রেডিও এবং টেলিভিশন প্রথমা শুরু হওয়ার সংবাদ প্রচার করে এটা প্রথমা প্রমাণিত হওয়ার বিশ্বাস জন্ম দেয় কিম্বা 'ওলী-এ-ফকীহ' এর পক্ষ থেকে হুকুম জারি হয় তাহলে যথেষ্ট হবে। অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন নেই। [রাহবার আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী) ফতোয়া অনুসারে, ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলরের তত্বাবধানে রচিত আহ্কাম শিক্ষা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১১]।

(৫) 'ওলী-এ-ফকীহ' ব্যতীত কোন ধর্মীয় নেতা বা মারজাগণ যদি প্রথমার চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোন ঘোষণা করেন তবে তা তার মুকাল্লিদ বা অন্যের জন্য তা যথেষ্ট হবে না যদি কিনা প্রথমার চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে মুকাল্লিদ বা অন্যের নিকট বিশ্বাস জন্মায়। [রাহবার আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী) ফতোয়া সংকলন আজবেবাতুল ইস্তিফতাআত, ১ম খন্ড, ৮৬২ নং প্রশ্নের উত্তর]।

(৬) যদি কোনো ব্যক্তি প্রথমার চাঁদ দেখতে পায় এবং জানে যে তার শহরের ফকীহ্র জন্য যে কোনো কারণেই হোক চাঁদ দেখা সম্ভব নয় তাহলে ফকীহকে চাঁদ দেখার বিষয়ে অবগত করা ওয়াজিব নয় যদি না এতে কোনো অকল্যাণ বয়ে আনে। (রাহবার আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী) ফতোয়া অনুসারে, ইরান দূতাবাস দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলরের তত্বাবধানে রচিত আহ্কাম শিক্ষা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১০)।

(৭) কোনো সরকার কর্তৃক চাঁদের প্রথমার ঘোষণাকে অনুসরণ করে চলার ক্ষেত্রে উক্ত সরকারের ইসলামী হওয়ার শর্ত নেই; বরং এক্ষেত্রে মাপকাঠি হলো সেই এলাকায় চাঁদ দেখার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারা যেখানে চাঁদ দেখা মুকাল্লাফের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে। [রাহবার আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী) ফতোয়া অনুসারে, ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলরের তত্বাবধানে রচিত আহ্কাম শিক্ষা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১০]।

(৮) নতুন বা প্রথমা চাঁদ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হলো সেই প্রথমা চাঁদ যা সূর্যাস্তের পরে অস্ত যায় বা অদৃশ্য হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সাধারণত সেটা দেখা সম্ভবপর হয়। নতুন চাঁদ আকারে ছোট বা বড় এবং নীচুতে বা উঁচুতে হওয়া নতুন চাঁদের প্রথমা বা দ্বিতীয়া হওয়ার উপর শারয়ী দলিল হতে পারে না।

(৯) কেউই যদি রমযানের নতুন চাঁদ দেখেছে বলে দাবী না করে তাহলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করার পর রমযানের রোযা শুরু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আকাশ পরিস্কার বা মেঘলা থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।
(১০) মাসের প্রথম চাঁদ দেখা বা তালাশ করা নিজের জন্য কোন শারয়ী ওয়াজিব কাজ নয়, মুস্তাহাব বিষয়।

নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে জ্যোতির্বিদ বৈজ্ঞানিকদের মতামত :

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- "তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা পালন করো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতারও করো না। আর যদি আকাশ তোমাদের উপর মেঘাচ্ছাদিত হয়, তবে সংখ্যা ত্রিশ পূর্ণ করবে।" [সূত্র : মুয়াত্তা, ইমাম মালিক (রঃ) প্রথম খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, রোযা অধ্যায়, হাদীস নং-৩, পৃষ্ঠা-৩৫৬]।

নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে চোখ দ্বারা দেখা- যা রাসূল (সাঃ) এর যুগে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। তবে কোন যন্ত্র দ্বারা দেখা আর চোখ দ্বারা দেখার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং উভয় দিকই গ্রহণযোগ্য হবে। এখানে মাপকাঠি হলো 'দর্শন' কথাটা বজায় থাকা। কাজেই চোখ বা চশমা এবং টেলিস্কোপ দ্বারা দেখার হুকুম একই বলে বিবেচিত হবে। আবার পবিত্র আল-কুরআনের সূরা নাহলের ১৬নং আয়াতে বলা হয়েছে- "আর তারা পদচিহ্নসমূহ ও নক্ষত্রাদির সাহায্যে পথনির্দেশ লাভ করে।" এখানে 'তারকারাজির দ্বারা পথনির্দেশ লাভ' বলতে তারকারাজির অবস্থান দৃষ্টের সমুদ্র বক্ষ ও স্থলভাগে চলার পথ বা দিক নির্ণয় বোঝায়, মাসের দিনসমূহ ও নতুন চাঁদ উদয়ের দিন নির্ণয় বোঝায় না। তবে 'দেখা' হচ্ছে কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। 'দেখা' স্বয়ং লক্ষ্য নয়, ঠিক যেভাবে অন্য যে কোন ক্ষেত্রে নিশ্চিত জ্ঞানে উপনীত হবার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্য নেয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদ বৈজ্ঞানিকদের মতামত সম্ভাব্যতার ওপর ভিত্তিশীল, নিশ্চয়তার ওপর নয়। তারা নিজেরা বিভিন্ন বিষয়ে অভিন্ন মতে পৌছাতে পারে না। যখন তারা তাদের ভবিষ্যদ্বাণীকে নির্ভূলভাবে সত্য প্রমাণিত করতে সক্ষম হবেন, তখন কেবলমাত্র তাদের মতামতের ওপর নতুন চাঁদ দেখার ঘোষণা নির্ভর করা যেতে পারে।

সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা রাখা ও ঈদ উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে :

কেউ কেউ মনে করেন যে, মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সারা বিশ্বে একই দিন রোযা আরম্ভ এবং একই দিনে ঈদ উদ্‌যাপন করা আবশ্যক। কিন্তু তাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করতে হলে

কোন নির্দিষ্ট স্থানকে চন্দ্রের উদয়স্থলের মানদন্ডরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ শরীয়তে কোন স্থানকে এরূপে মানদন্ড সাব্যস্ত করেনি। আর শরীয়তের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে নিজেদের মতামতের ভিত্তিতে কোন স্থানকে মানদন্ডরূপে ঘোষণা করা হলে তাতে উম্মাতের মধ্যে আরো অধিক ইখতিলাফ বা অনৈক্য সৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

আবার বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ উদ্‌যাপন করতে গেলে- "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রেখো এবং চাঁদ দেখে ঈদ করো।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এ হাদীসের উপর সকল এলাকার লোকদের আমল করা সম্ভব নয়। তখন চাঁদ দেখা সত্ত্বেও বিশ্বের কোন কোন অঞ্চলের লোক রোযা ও ঈদ পালন করতে পারবে না এবং চাঁদ না দেখেও কোন কোন অঞ্চলের লোকদের (একই দিনে রোযা ও ঈদ করার স্বার্থে) রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে। অথচ তা যেমন বাস্তব সম্মত নয় তেমন কুরআন ও হাদীসেরও পরিপন্থী।

আমাদের দেশের কিছু অঞ্চলে কতক ব্যক্তি নিজেদের মন মর্জি বা চিন্তার আলোকে সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে রমযান মাস শুরু এবং ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করেন, যা সম্পূর্ণভাবে নাজায়েজ কাজ। এ সম্পর্কে একটি হাদীস হচ্ছে, কুরায়ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে ফযল বিনতুল হারিস তাকে মুয়াবিয়ার নিকট শাম (সিরিয়া) দেশে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া পৌছে তার প্রয়োজন পূর্ণ করি। আমি সিরিয়া থাকাবস্থায় রমযানের চাঁদ ওঠে এবং আমরা তা জুমআ'র রাত্রিতে অবলোকন করি। এরপর আমি রমযানের শেষের দিকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বিশেষ করে চাঁদ দেখা সম্পর্কে বলেন, তোমরা রমযানের চাঁদ কখন দেখেছিলে? আমি বলি, আমি তা জুমআ'র রাত্রে দেখেছি। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি নিজেও কি তা দেখেছিলে? আমি বলি, হ্যাঁ এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখে এবং তারা রোযা রাখে, এমনকি মুয়াবিয়াও রোযা রাখেন। তিনি বলেন, আমরা তো তা শনিবারে দেখেছি। কাজেই আমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রোযা রাখব অথবা শাওয়ালের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রেখে যাবো। আমি জিজ্ঞাসা করি, মুয়াবিয়ার দর্শন ও রোযা রাখা কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়? তিনি বলেন, না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।" (আবূ দাউদ শরীফ, ইফাবা, দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-২৩২৬, পৃষ্ঠা-২৩৮; মুসলিম শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-২৩৯৫, পৃষ্ঠা-৪১১)।

রোযার প্রকারভেদ :

ফকীহ্গণ রোযাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন :

(১) ওয়াজিব রোযা: ওয়াজিব বা ফরয যা পালন করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। 'ইমামীয়া বা জাফরী মাযহাব' অনুযায়ী বালেগ হওয়ার শরীয়তসম্মত বয়স হল- চন্দ্র বছর অনুযায়ী মেয়েদের জন্য ৯ (নয়) বছর এবং ছেলেদের জন্য ১৫ (পনের) বছর। তখন তাদের উপর রোযা ওয়াজিব হয়।

(২) মুস্তাহাব : যা পালন করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়।

(৩) মাকরুহ : যা না করাই ভাল তবে করলে গোনাহ নেই।

(৪) হারাম : যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(১) ওয়াজিব রোযা :

(ক) রমযান মাসের রোযা অর্থাৎ পুরো রমযান মাস ব্যাপী রোযা।

(খ) রমযান মাসের কাযা রোযা।

(১) 'কাযা' অর্থ ক্ষতিপূরণ করা। রোযা কাযা করার অর্থ কোন শরীয়তসম্মত কারণে রোযা ভঙ্গ হলে সে রোযা রমযানের পরে আদায় করা। যতটি রোযা ভাঙা হল, ঠিক ততটি রোযা অন্য সময়ে আদায় করাকে কাযা বলে। ইবাদতের ক্ষেত্রে 'কাযা' অর্থ কোন ইবাদত তার নির্ধারিত সময়ের পরে আদায় করা।

(২) রমযান মাসের রোযা যে বছরে কাযা হয়েছে সে বছরেই আদায় করতে হবে অর্থাৎ যে রমযানে রোযা কাযা হয়েছে তার পরবর্তী রমযানের পূর্বেই কাযা আদায় করতে হবে। যেসব দিনে রোযা রাখা হারাম সেসব দিন ব্যতীত যে কোন দিনেই কাযা রোযা আদায় করা যাবে। আল্লাহ রোযা রাখার জন্য কেবল রমযান মাসের দিনগুলোকে নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং কোন শরীয়ত সমর্থিত ওজরের কারণে যারা রমযানের রোযা রাখতে অপারগ হন তারা অন্য দিনগুলোয় এ রোযা রাখতে পারেন, এর পথও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

(৩) কেউ যদি যে রমযানের রোযা কাযা হয়েছে তার পরবর্তী রমযান শুরু হবার পূর্বেই তা আদায়ে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আদায় না করেন তাহলে তাকে পরে ঐ রোযা কাযা করা ছাড়াও কাফ্ফারাহসহ আদায় করতে হবে। কিন্তু তিনি যদি ঐ বছরের মধ্যে কাযা আদায় করতে অসমর্থ হন, উদাহরণ স্বরূপ কাযা হওয়া রমযান ও পরবর্তী রমযান পর্যন্ত পুরো সময় যদি তিনি অসুস্থ থাকেন তাহলে এ অবস্থায় তাকে কাযা আদায় করতে হবে না, তবে কাযা হওয়া প্রতিটি রোযার জন্য এক 'মুদ্দ' পরিমাণ খাদ্য (কাফ্ফারাহ্) দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, এক 'ছা' = ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম, ২ 'মুদ্দ' = এক 'ছা' এর অর্ধেক অর্থাৎ ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম, এবং এক 'মুদ্দ' = ৮২৫ গ্রাম খাদ্য।

(৪) কোন ব্যক্তি রমযানের কাযা রোযা রাখেন অতঃপর মধ্যদুপুরের পূর্বে রোযা ভঙ্গ করতে পারবেন, পরে নয়। যদি তিনি মধ্যদিনের পর রোযা ভঙ্গ করেন তাহলে তাকে কাফ্ফারাহ্ স্বরূপ দশজন দরিদ্রকে এক 'মুদ্দ' করে (৮২৫ গ্রাম করে) খাবার দিতে হবে। আর তাতে যদি অসমর্থ হন তাহলে তাকে কাফ্ফারাহ্ স্বরূপ রমযানের পরে তিন দিন ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতে হবে।

(৫) তাকলীফের বয়সে উপনীত হওয়ার পর থেকে রমযানের যে রোযা বাদ পড়েছে তার কাযা আদায় করা রোযাভঙ্গকারীর উপর ওয়াজিব। আর যদি রমযানে ইচ্ছাকৃতভাবে ইক্তিয়ার সহকারে এবং শরীয়ত-স্বীকৃত কোন ওযর ছাড়াই রোযাভঙ্গ করা হয় তাহলে কাযা ছাড়াও কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব।

(গ) কাফ্ফারার রোযা :

(১) 'কাফ্ফারা' শব্দের অর্থ গোপন করা, ঢেকে রাখা, আবৃত করা। অর্থাৎ 'যাহা পাপ আবৃত করে'।' শরীয়তের ভাষায় কোন গোনাহ কাজকে ঢেকে রাখতে বা প্রতিরোধ করতে যা কিছু করা হয় তাকে 'কাফ্ফারা' বলে। 'কাফ্ফারা' হচ্ছে কাজে ত্রুটি হয়ে যাওয়ার পর সদকা বা রোযার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা। রোযা ভঙ্গের এমন কতগুলো কারণ রয়েছে যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে ঐ রোযার কাযা ও কাফ্ফারা দুটোই আদায় করতে হয়। কাফ্ফারার রোযা বিভিন্ন ধরনের। এর মধ্যে রয়েছে রমযানের রোযা না রাখাজনিত কাফ্ফারাহর রোযা, অনিচ্ছাকৃত হত্যার কাফ্ফারাহ্র রোযা, শপথ (কসম) ও মানত ভঙ্গের কাফ্ফারাহ্র রোযা ও যেহার (কেউ যদি রাগের বশে স্ত্রীকে তার মায়ের মত হারাম বলে ঘোষণা করে তাকে 'যেহার' বলে।) এর কাফ্ফারাহ্র রোযা।

(২) কাফফারার পরিমাণ ও পদ্ধতি হলো রমযান মাসের রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে ভাঙ্গার কাফফারা নিম্নের যে কোন একটি। (ক) একজন গোলাম মুক্ত করা। (খ) দু'মাস (৬০দিন) রোযা রাখা। (গ) ৬০ জন গরীবকে খাবার দেয়া। যেহেতু এ যুগে দৃশ্যত কোনো গোলাম রাখার প্রচলন নেই যাকে মুক্ত করা যায় সুতরাং মুকাল্লাফ ব্যক্তিকে পরবর্তী দু'টি কাজের যে কোন একটি পালন করতে হবে।

(৩) ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের কোন রোযা ভাঙ্গার কারণে কাফ্ফারাহ্ স্বরূপ যার ওপর অবিচ্ছিন্নভাবে দুই মাস রোযা রাখা ওয়াজিব তিনি এ ধারাবাহিকতার শর্ত পূরণের জন্যে এটিই যথেষ্ট যে, তিনি প্রথমে এক মাস বিরতি ব্যতিরেকেই রোযা রাখবেন এবং পরবর্তী মাসের কমপক্ষে প্রথম রোযাটি রাখবেন। এরপর তিনি কয়েকদিন বাদ দিয়ে যতদিনের রোযা বাকি ছিল ততদিন রোযা রাখতে পারেন। কিন্তু বৈধ কারণ ব্যতীত তিনি যদি প্রথম মাসের একটি রোযাও বাদ

দেন বা ভঙ্গ করেন তাহলে তাকে নতুন করে শুরু করতে হবে। কিন্তু যদি কোন বৈধ কারণে ভঙ্গ করে, যেমন অসুস্থতা বা ঋতুস্রাবের কারণে, তাহলে তার ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য হবে না এবং তিনি ওযর দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, অতঃপর অবশিষ্ট রোযা শুরু করবেন।

(৪) যদি কারো পক্ষে দুই মাস রোযা রাখা বা দাসমুক্ত করা বা ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানো কোনোটাই সম্ভব না হয় তখন যে কয়জন গরীবকে খাবার দিতে সক্ষম হবেন সে কয়জনকে খাবার দেবেন। আর এহতিয়াতে ওয়াজিব হলো ইস্তিগফার ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যদি কোনো ক্রমেই অভাবীদেরকে খাবার দিতে সক্ষম না হন তাহলে কেবল ইস্তিগফার করলেই যথেষ্ট। (সূত্রঃ রাহবারের দফতর থেকে ইস্তফতা, মাসআলা-৪৯)। এ প্রসংঙ্গে একটি হাদীস হচ্ছে- এক ব্যক্তি রমযানের রোযা ভঙ্গ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে একটি ক্রীতদাস আযাদ করার নির্দেশ দিলেন অথবা একনাগাড়ে দুই মাস রোযা রাখার অথবা ষাটজন মিসকিনকে আহার দেয়ার জন্য বললেন। লোকটি বলল: 'আমি সামর্থ্য রাখি না।' তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এক টুকরি (ছোট এক ঝুড়ি) খেজুর আনা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "এটা গ্রহণ কর এবং সদকা কর।" (মুয়াত্তা, ইমাম মালিক (রঃ), ইফাবা, প্রথম খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, রোযা অধ্যায়, হাদীস নং ২৮, পৃষ্ঠা-৩৬৭)।

(৫) যদি রোযাদার ব্যক্তি একদিনের মধ্যে একাধিকবার যৌন সহবাস কিম্বা হস্তমৈথুন করে থাকে তাহলে তাকে প্রতি বারের জন্য আলাদা কাফ্ফরাহ দিতে হবে; অর্থাৎ যতবার করবেন ততগুলো কাফফারা দিতে হবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি একদিনে একাধিক বার পানাহার করে থাকে তাহলে তার জন্য একটি কাফ্ফারাহ্ দেয়াই যথেষ্ট হবে।

(ঘ) যে মুস্তাহাব রোযা মানত, অঙ্গীকার ও কসমের মাধ্যমে ওয়াজিব হয়:

(ঙ) এসতিজারি রোযা অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি মজুরির বিনিময়ে মৃত ব্যক্তির জন্য রোযা রাখতে রাজি হয় :

(চ) ই'তিকাফের দিনসমূহের তৃতীয় দিনের রোযা : মুস্তাহাব ই'তিকাফের ১ম ও ২য় দিনে রোযা পরিত্যাগ করা যায় কিন্তু দু'দিন পূর্ণ হয়ে গেলে তৃতীয় দিনের ই'তিকাফে রোযা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং তা পরিত্যাগ করা যাবে না।

(ছ) তামাত্ত হজ্জে কুরবানীর পরিবর্তে রোযা : যদি কোন হাজী সাহেব হজ্জের মধ্যে কুরবানীর সামর্থ্য না রাখেন এবং ঋণ গ্রহণ করতেও না পারেন তাহলে তৎপরিবর্তে দশ দিন রোযা রাখতে হবে। এর মধ্যে তিন দিনের রোযা হজ্জের সফরের মধ্যেই আর বাকি সাত দিনের রোযা হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর তার আবাসস্থলে রাখতে হবে। এ সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনের সূরা বাকারা, ১৯৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে- "যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়

তবে তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে।"

(জ) পিতার কাযা রোযা বড় ছেলের উপরে ওয়াজিব : যদি কোন সঙ্গত কারণে কোন ব্যক্তির রোযা কাযা হয় এবং পরে সে কাযা আদায়ের সমর্থ হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জীবদ্দশায় তা আদায় করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য তার পক্ষ থেকে ঐ কাযা রোযা আদায় করা ওয়াজিব হবে। তবে সে (জ্যেষ্ঠপুত্র) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লোক নিয়োগ করে কাযা রোযা আদায় করতে পারবে।

(২) মুস্তাহাব রোযা :

হারাম ও মাকরুহ দিবসগুলো ব্যতীত বছরের অন্যান্য দিনের রোযা মুস্তাহাব। মুস্তাহাব রোযা সম্পর্কে ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে সে ওই কাজের দশগুণ পরিমাণ পুরস্কার পাবে। এ রকম একটি নেক কাজ হচ্ছে প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা।" (সূত্র : ওয়াসায়েলুশ শিয়া, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৩, হাদীস-৩৩)।

ইমাম মুসা কাজিম (আঃ) বলেছেন, "বেহেশতের একটি নদীর নাম হচ্ছে 'রজব'। যার পানি হচ্ছে দুধের থেকেও সাদা ও মধুর থেকেও মিষ্টি। যদি কেউ 'রজব' মাসে একদিন রোযা রাখে তবে আল্লাহ তা'য়ালা ওই নদী থেকে ঐ রোযাদারকে পানি পানের অনুমতি দান করবেন। (সূত্র : ওয়াসায়েলুশ শিয়া, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৫০, হাদীস-৩)।

উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কখনো একাধারে দুই মাস রোযা পালন করতে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, তিনি শা'বান মাসকে রমযান মাসের সাথে মিলাতেন (রোযা পালন সহ) অর্থাৎ তিনি একাধারে শা'বান ও রমযান মাসের রোযা পালন করতেন।" (সুনানু নাসাঈ শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ, হাদীস নং-২১৭৯, পৃষ্ঠা-৬৬; সুনানু ইবনে মাজাহ্, ইফাবা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-১৬৪৮, পৃষ্ঠা-৮৫)।

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি শা'বান মাসের শেষ তিন দিন রোযা রাখবে এবং তা রমযান মাসের রোযার সাথে সংযোগ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে পরপর দুই মাসের রোযা রাখার সওয়াব দান করবেন।" (সূত্র : ওয়াসায়েলুশ শিয়া, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৭৫, হাদীস-২২)।

(৩) হারাম রোযা :

(ক) ঈদুল ফিতর (১ম শাওয়াল) ও ঈদুল আযহার (১০ যিলহজ্জ) দিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই দিবসে রোযা নিষেধ করেছেন- 'ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন।" [সূত্র : মুয়াত্তা, ইমাম মালিক (রঃ), ইফাবা, প্রথম খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, রোযা অধ্যায়, হাদীস নং ৩৬, পৃষ্ঠা-৩৭১]।

(খ) যে দিন সম্পর্কে জানা নেই যে তা শাবানের শেষ দিন না রমযানের রোজার ১ম দিন। সে দিন যদি রমযানের ১ম দিনের রোযার নিয়্যতে রাখা হয় তাহলে সেটা হারাম রোযা হবে।

(গ) যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোযা রাখেন নি এবং পানাহার করেছেন কিন্তু পরে নিশ্চিত হয়েছেন যে, ঐ দিনটি রমযানের একটি দিন, অতঃপর ঐ সময় থেকে তার জন্য রোযা ভঙ্গকারী কাজ হতে বিরত থাকা অপরিহার্য এবং পরে তাকে ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে কিনা এ ব্যাপরে অধিকাংশ ইমামী ফকীহ্গণের মতে, তার উপরে এ কাযা ওয়াজিব নয়। কিন্তু তিনি যদি রমযানের রোযার নিয়্যতে রোযা রেখে থাকেন তাহলে তাকে কাযা আদায় করতে হবে।

(ঘ) গোনাহের কাজের জন্য মানতের রোযা:

(ঙ)'আইয়ামে তাশরীক' ১১, ১২ এবং ১৩ই-যিলহজ্জ -এর দিনগুলোতে কেবল মীনায় অবস্থানকারীদের জন্য রোযা রাখা হারাম। উল্লেখ্য, যিলহজ্জ মাসের উক্ত তিন দিনকে 'আইয়ামে তাশরীক' বলে।

(চ) চুপচাপ থাকার রোযা অর্থাৎ কারো সাথে কথা বলবো না এ নিয়্যতে রোযা রাখা।

(ছ) সন্তান মুস্তাহাব রোযা রাখলে সেটা যদি পিতা মাতার কষ্টের কারণ হয়। ও কোন নারী মুস্তাহাব রোযা রাখলে যদি তার স্বামীর কোন অধিকার আদায়ে ব্যাঘাত ঘটে তাহলে তার জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া এ ধরনের রোযা রাখা সহীহ হবে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রমযান মাসের বাইরে স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন মহিলা যেন রোযা পালন না করে।" (সূত্র : তিরমিযী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-৭৮০, পৃষ্ঠা-১৩৩)।

(ঝ) পিতা-মাতার নিষেধ থাকা সত্বেও সন্তানের মুস্তাহাব রোযা রাখা।

(৪) মাকরুহ রোযা :

(ক) আশুরার দিনের রোযা (১০ই মহররম) :

আলকামা (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশ'আস ইবনে কায়স (রঃ) ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। সেটা আশূরার দিন ছিল। তখন তিনি খানা খাচ্ছিলেন। এ দেখে আশ'আস (রঃ) বললেন, হে আবদুর রহমানের পিতা! আজ তো আশূরার দিন। তিনি বললেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে এ দিনে রোযা পালন করা হতো। কিন্তু রমযানের রোযা ফরয হলে এ দিনের রোযা পালন ছেড়ে দেয়া হয়।" (সূত্র : মুসলিম শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, হাদীস নং- ২৫১৮, পৃষ্ঠা-৪৫১)।

(খ) যে দিন সম্পর্কে সন্দেহ থাকে যে তা আরাফাত-দিবস (৯ই যিলহজ্জ) না কি ঈদুল আযহার দিবস (১০ই যিলহজ্জ) সেদিন রোযা রাখা মাকরুহ।

(গ) আরাফাত দিবসে রোযা রাখার কারণে যদি ঐ দিনের দোয়া সমূহ থেকে

বঞ্চিত হয়।

(ঘ) রোযা রাখার জন্য শুধু শুক্রবার বা শনিবারকে নির্দিষ্ট করা মাকরুহ।

(ঙ) মেজবানের অনুমতি ছাড়া মেহমানের ও পিতার অনুমতি ছাড়া নাবালেগ সন্তানের রোযা মাকরুহ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কেউ যদি কোন কাওমের মেহমান হয়, তবে সে যেন তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে (নফল) রোযা পালন না করে।" (সূত্র : তিরমিযী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-৭৮৭, পৃষ্ঠা-১৩৭)।

(চ) মুস্তাহাব রোযা অবস্থায় মু'মিনের দাওয়াত কবুল করা শারয়ীভাবে একটি উত্তম কাজ। তবে তার মু'মিন ভাইয়ের দাওয়াতে খাওয়ার কারণে যদিও রোযা বাতিল হয়ে যায় কিন্তু রোযার সওয়াব ও প্রতিদান থেকে তিনি বঞ্চিত হন না।

রোযা ভঙ্গের অনুমতিগুলো হলো :

(১) হায়েয ও নেফাস :

নারীদের জন্য তাদের মাসিক ঋতুস্রাব (হায়েয) কালে ও সন্তান জন্মদান-পরবর্তী রক্তপাত (নিফাস) অব্যাহত থাকাকালে রোযা রাখা জায়েজ নয়। মহিলাদের ঋতু হওয়া মাত্রই তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। যদি কোনো মহিলা দিনের মধ্যভাগে হায়েয বা নেফাসের রক্ত দেখতে পায় তাহলে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। যদিও তা মাগরিবের নিকটবর্তী সময়ে হয়। পরবর্তীতে পবিত্র হওয়ার পর উক্ত রোযা কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

(২) অসুস্থ :

(ক) অসুস্থ অবস্থায় কোন ব্যক্তি রোযা রাখলে তিনি যদি আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন বা তার রোগ বৃদ্ধি পায় অথবা আরোগ্য লাভ পিছিয়ে যায় তার জন্য ঐ অবস্থায় রোযা রাখা জায়েজ নয়। কারণ অসুস্থতার কারণে ব্যক্তির ক্ষতি সাধন বা ক্ষতি ডেকে আনা হারাম। তবে শরীর স্বাভাবিক থাকার পর কেউ যদি রোযা রাখার কারণে খুবই দূর্বল হয়ে পড়েন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা সহ্য করা সম্ভব হয়, তাহলে যতক্ষণ তা সহ্য করা সম্ভব হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করা জায়েজ নয়।

(খ) রোগের উদ্ভব কিম্বা বৃদ্ধি এবং রোযা রাখতে অক্ষমতার বিষয়ে রোযার প্রভাব নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো স্বয়ং রোযাদার ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে বিবেচনা। সুতরাং যদি চিকিৎসক বলেন, রোযা রাখা ক্ষতিকর কিন্তু তিনি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন যে ক্ষতিকর নয় তাহলে রোযা রাখতে হবে। তদ্রুপ যদি চিকিৎসক বলেন, রোযা ক্ষতিকর না কিন্তু তিনি জানেন যে রোযা তার জন্য ক্ষতিকর কিম্বা রোযায় ক্ষতির আশংকা রয়েছে তাহলে তিনি রোযা রাখবেন না।

(৩) মায়ের গর্ভাবস্থায় ও সন্তানকে দুগ্ধ দান কালে :

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "যে গর্ভবতী মহিলা নিজের জীবনের আশংকা করে এবং যে স্তন্যদানকারী মহিলা নিজের সন্তানের জীবনের উপর আশংকা করে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এদের উভয়ের জন্য রোযা ছেড়ে দেওয়ার অবকাশ দিয়েছেন।" (সূত্র : সুনানু ইবনে মাজাহ্, ইফাবা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-১৬৬৮, পৃষ্ঠা-৯২)।

(ক) যে গর্ভবতী মহিলা স্বীয় গর্ভস্থ শিশুর জন্য রোযা ক্ষতিকর মনে করেন তাকে রোযা ত্যাগ করতে হবে এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ফিদিয়া প্রদান করতে হবে আর রোযার কাযাকেও পরবর্তীতে আদায় করতে হবে।

(খ) দুগ্ধদাত্রী মহিলা রোযার কারণে যার দুধ কমে বা শুকিয়ে গেছে, তিনি যদি স্বীয় শিশুর জন্য ক্ষতিকর মনে করেন তাহলে তাকে রোযা রাখা পরিহার করতে হবে এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ফিদিয়া প্রদান করতে হবে। আর রোযার কাযাও পরবর্তীতে আদায় করতে হবে। আর ফিদিয়ার পরিমাণ হচ্ছে- ১ 'মুদ্দ' = ৮২৫ গ্রাম পরিমাণ খাবার যা গরীবকে ফিদিয়া হিসেবে দিতে হবে।

(৪) সফর :

মুসাফিরের জন্য নামায কসর করার শর্তাবলী পূর্ণ হয়ে থাকলে তিনি রোযা রাখলে তা কবুল হবে না। সূরা আল-বাকারা, ১৮৫নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে রোযা পালন করে। এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিবে।" এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সফরে রোযা পালনে কোন নেকী নেই।" (সূত্র : বুখারী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, হাদীস নং-১৮২২, পৃষ্ঠা-২৬২)।

উল্লেখ্য, মুসাফির হচ্ছেন যিনি সফররত। আর মুকীম হচ্ছেন যিনি সফররত নয়।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে রোযারত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। এরপর যখন তিনি কুরাউল গামীম নামক স্থানে পৌছলেন, তখন লোকেরাও রোযারত ছিল। এরপর তিনি একটি পানির পাত্র চাইলেন। এমনকি লোকেরা তাঁর দিকে তাকাতে লাগল। এরপর তিনি পানি পান করলেন। তখন তাঁকে বলা হ'ল, কতিপয় লোক রোযারত রয়েছে। তিনি বললেন, তারা অবাধ্য, তারা অবাধ্য।" (সূত্র : মুসলিম শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-২৪৭৭, পৃষ্ঠা-৪৩৭)।

আবূ উমাইয়া দমরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার সফর থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসলেন আর তখন তিনি সাওম পালন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি দ্বিপ্রহরের আহার করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না? তিনি বললেন, আমি তো রোযা পালন করছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি কাছে এসো; আমি তোমাকে মুসাফিরের রোযার বিধান সম্পর্কে অবহিত করি। আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে রোযাকে মুলতবী এবং অর্ধেক সালাতকে রহিত করে দিয়েছেন।" (সূত্র : সুনানু নাসাঈ শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ, হাদীস নং-২২৭৫, পৃষ্ঠা-৯৭)।

অতএব, কেউ যদি মনে করেন সফররত অবস্থায় রোযা রাখা ব্যক্তির ইচ্ছা ও পছন্দের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। তিনি যদি রোযা রাখেন তথাপি তাকে কাযা করতে হবে, তবে কাফ্ফারাহ দিতে হবে না। এটি মধ্যদুপুর অর্থাৎ যোহর (যাওয়াল)-এর পূর্বে সফরে বহিঃর্গত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু তিনি যদি মধ্যদুপুরে বা তারপরে সফরে বের হন তাহলে তাকে রোযা রাখতে হবে। আর তিনি যদি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গকারীর জন্যে নির্ধারিত কাফ্ফারাহ্ দিতে হবে। আর মুসাফির যদি মধ্যদুপুরের পূর্বেই নিজ শহর (বসত এলাকা বা নিজের জন্মভূমি) বা যেখানে দশ দিন থাকবে বলে নিয়্যত করেছেন সেখানে পৌছে যান এবং তার পূর্বে রোযা ভঙ্গকারী কোন কাজ না করে থাকে তাহলে তার রোযা পূর্ণ করা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় যদি তিনি রোযা ভঙ্গ করেন তাহলে তার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গকারীর হুকুম কার্যকর হবে।

যে ব্যক্তি নিজের বসত এলাকা বা নিজের জন্মভূমি (ওয়াতান) বাদে এমন কোন স্থানে পৌছান বা অবস্থান করেন যেখানে তিনি দশ দিনের কম অবস্থানের চিন্তা-ভাবনা করেন সেস্থানে তার নামায কসর হবে এবং তাকে রোযা রাখতে হবে না। অর্থাৎ একজন মুসাফির ব্যক্তি যে শর্তের প্রেক্ষিতে যোহর, আসর ও এশার নামায কসর করবেন সেই একই শর্তাবলীর ভিত্তিতে রোযা রাখতে পারবেন না। 'কস্র' আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ বস্তু হ্রাস করা কিংবা আবদ্ধ রাখা। শরীয়তের পরিভাষায় নামাযের 'কস্র' করার অর্থ সফরের সময় চার রাক'আত বিশিষ্ট নামায দু'রাক'আত করে আদায় করা। ফকীহ্গণের মতে, কস্র ঐচ্ছিক নয় আবশ্যিক (ওয়াজিব)। আর শারয়ী মোতাবেক একজন মুসাফিরের সফরের দূরত্ব হচ্ছে যাওয়া-আসা উভয় দিক মিলে ৮ (আট) ফারসাখ। তবে যাওয়ার দূরত্ব ৪ (চার) ফারসাখ এর কম হলে হবে না। উল্লেখ্য যে, ১ (এক) ফারসাখ = ৫.৬০ কিঃ মিঃ। ৮ (আট) ফারসাখ=৪৪.৮০ কিঃ মিঃ। ৪ (চার) ফারসাখ=২২.৪০ কিঃ মিঃ।

(৫) তৃষ্ণা ও ক্ষুধা :

কেউ যদি বেশি পিপাসার্ত হয়ে পড়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তিনি রোযা ভঙ্গ করতে পারবেন। পরবর্তীতে কাযা করতে হবে এবং এক 'মুদ্দ' পরিমাণ খাবার কাফ্ফারাহ দিতে হবে। কিন্তু ক্ষুধার কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েজ নয়। যদি না এর ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার আশংকা থাকে।

(৬) বার্ধক্য :

যে সব বৃদ্ধ নারী-পুরুষের পক্ষে রোযা রাখা ক্ষতিকর ও কঠিন, তারা রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতে পারবেন, কিন্তু তাদেরকে 'ফিদইয়াহ্' দিতে হবে। বাদ দেয়া প্রতিটি রোযার বিনিময়ে একজন ফকিরকে এক 'মুদ্দ' খাদ্য জাতীয় বস্তু দিতে হবে। তেমনি যে অসুস্থ ব্যক্তির পুরো বছরের মধ্যে সুস্থ হবার সম্ভাবনা নেই তার জন্যও এ হুকুমই প্রযোজ্য।

(৭) অজ্ঞান হওয়া ও নেশাগ্রস্থতা :

বেহুঁশ ব্যক্তির জন্য রোযা অপরিহার্য নয়, এমন কি দিনের অংশবিশেষের জন্য বেহুঁশ থাকলেও। তবে কেউ যদি বেহুঁশ হবার পূর্বেই রোযা নিয়্যত করে থাকেন এবং বেহুঁশ হবার পরপরই তার সংজ্ঞা ফিরে আসে তাহলে তাকে রোযা অব্যাহত রাখতে হবে। সংজ্ঞাহীন বা অচেতন ব্যক্তিকে রোযা কাযা করতে হবে না, এমন কি সংজ্ঞাহীনতা খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও নয়। তবে ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক, কেবল নেশাগ্রস্থতার জন্যই রোযা কাযা করতে হবে।

(৮) বিচার-বুদ্ধিহীন বা পাগল :

বিচার-বুদ্ধিহীন বা পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য রোযা ওয়াজিব নয় এবং এরূপ অবস্থায় তিনি রোযা রাখলেও তা সহীহ হবে না।

(৯) বিশেষ দিক :

যে সব কারণে রোযা না রাখা বা ভঙ্গ করা জায়েজ সেগুলির বিলুপ্তি ঘটলে, যেমন অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করলে, নাবালেগ বালেগ হলে, মুসাফির বাড়ী ফিরে এলে বা নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হলে রোযার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রোযা ভঙ্গকারী কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব।

রোযার নিয়্যত :

(১) রোযার নিয়্যত অর্থাৎ রোযা রাখার উদ্দেশ্য বা সংকল্প পোষণ করা অপরিহার্য। আর নির্ভেজাল নিয়্যত বা সংকল্প হচ্ছে, মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যেই কাজ করবে এবং অন্তরের গভীরে তাঁর উদ্দেশ্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের কামনা করবে, আর অন্য কারোর নিকট থেকে তার প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতার অপেক্ষা করবে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "নিয়্যাতুল মু'মিনি খায়রমি্ মিন আমালিহ।" মু'মিনের সংকল্প তার কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সূত্র : বিহারুল আনওয়ার, খন্ড-৭০, পৃষ্ঠা-২১০)।

(২) রোযার নিয়্যতকে মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। যেমন মনে মনে বললেই হবে, "আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মাহে রমযানের ওয়াজিব রোযা রাখছি, কুরবাতান ইলাল্লাহ।'

(৩) উত্তম হচ্ছে পবিত্র রমযান মাসে প্রথম রাত্রি থেকে সম্পূর্ণ মাসের রোযাসমূহের নিয়্যত করে তার উপর অটল থাকা। আবার প্রতিদিনের রোযার জন্য পৃথক পৃথক নিয়্যত করা যায়। কিন্তু রমযান মাসের রোযা ছাড়া অন্য নির্দিষ্ট ওয়াজিব রোযা যেমন- কাযা রোযা বা মানতকৃত রোযাসমূহের জন্য প্রতিদিন আলাদা নিয়্যত করতে হবে-চাই রোযাসমূহ স্বল্প বা অধিক হোক।

(৪) ওয়াজিব রোযার নিয়্যত করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার কারণ ব্যতীত তা অবশ্যই যেন ফজরের আযানের পূর্বে করা হয়। তবে কোন ব্যক্তি ওয়াজিব রোযার নিয়্যত যদি কোন কারণে, যেমন- ভুলে যাওয়া অথবা সফরে যাওয়ার কারণে না করে থাকেন এবং যদি এমন কোন কাজ না করে থাকেন যা করলে রোযা বাতিল হয়ে যায় তাহলে তিনি যোহরের (যাওয়াল) পূর্ব পর্যন্ত নিয়্যত করতে পারবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি যদি সেহ্‌রী না খেয়ে রোযা রাখেন তাহলেও তার রোযা শুদ্ধ হবে।

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ :

রোযা ভঙ্গের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার প্রধান প্রধান কারণগুলো নিম্নোরূপ:

(১) পানাহার :

(ক) যদি রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু খায় বা পান করে তাহলে তার রোযা বাতিল হবে এবং তাকে রোযার কাযা আদায় ও কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হবে। তামাক ও তামাকজাতীয় দ্রব্যের ধূমপানও পানাহার হিসেবে গণ্য হবে।

(খ) যদি রোযাদার ব্যক্তি তার দাঁতের ফাঁকে আটকে যাওয়া কোন কিছু ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলে তাহলে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি দাঁতের ফাঁকে খাবার বেঁধে থাকা কিম্বা কণ্ঠনালীতে পৌছানোর ব্যাপারে তার নিশ্চিত জ্ঞান না থাকে অথবা তা গলাধ:করণ হওয়াটা যদি ইচ্ছাকৃত ও জ্ঞাতসারে না হয়ে থাকে তাহলে রোযা বাতিল হবে না।

(গ) রোযাদার ভুল করে বা বিস্মৃত হয়ে যদি কিছু খেয়ে ফেলেন বা পান করেন তাহলে তার রোযা বাতিল হবে না এবং তাকে কোন প্রকার 'কাফফারা' দিতে হবে না। এক্ষেত্রে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব রোযার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

(ঘ) থুথু গিলার কারণে রোযা বাতিল হয় না।

(ঙ) স্রেফ মুখ থেকে রক্ত বের হওয়ার কারণে রোযা বাতিল হয় না। তবে ওয়াজিব হলো তা গলা পর্যন্ত পৌছতে বাধা দেয়া এবং তা মুখ থেকে বাহিরে ফেলে দেয়া। আর তা যদি থুথুর সাথে মিশে বিলীন হয়ে যায় তাহলে পবিত্র বলে বিবেচিত হবে এবং তা গিলতে সমস্যা নেই। রোযাও বাতিল হবে না। তদ্রুপ থুথুর সাথে রক্ত মিশে থাকা অবস্থায় সন্দেহ হলে তা গিলতে আপত্তি নেই। এর ফলে রোযা সঠিক হওয়ার পথেও কোনো ক্ষতি হবে না।

(২) যৌনসঙ্গম :

(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে যৌন সঙ্গমের ফলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং এ ক্ষেত্রে কাযা ও কাফ্ফারাহ্ উভয়ই অপরিহার্য। কাফ্ফারাহ্ হচ্ছে একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করা; তা সম্ভব না হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখা; তাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানো। মুকাল্লিফ এ তিনটি কাজের যে কোন একটি বেছে নিতে পারেন।

(খ) কোন রোযাদার ব্যক্তি রমযান মাসে স্বীয় রোযাদার স্ত্রীর সাথে সহবাস (যৌন সঙ্গম) করে আর স্ত্রীও একাজে সম্মত থাকে তখন তাদের উভয়ের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা বিনষ্টকারী কাজ করার হুকুম প্রযোজ্য হবে। তাদের উভয়ের ওপরেই কাযা ছাড়াও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

(৩) হস্তমৈথুন :

(ক) রোযাদার ব্যক্তি যদি হস্তমৈথুন করেন, ফলে তার বীর্যপাত হয় তাহলে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। তাকে রোযার কাযা ও কাফ্ফারাহ্ উভয়ই আদায় করেতে হবে।

(খ) দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ ঘটার কারণে রোযা বাতিল হয় না। আর রোযাদার যদি জানেন যে দিনের বেলায় তিনি যদি ঘুমায় তাহলে তার স্বপ্নদোষ ঘটবে সেক্ষেত্রে ঘুম থেকে বিরত থাকার আবশ্যকতা নেই। তবে জাগ্রত হওয়ার পর অবিলম্বে গোসল করা ওয়াজিব হবে।

(৪) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা :

(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে রোযা বাতিল হবে এবং এজন্য রোযা কাযা করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমির কারণে রোযা বাতিল হবে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যার হঠাৎ করে বমি হয় তার কাযা নেই। আর যে স্বেচ্ছায় বমি করে, তার কাযা অপরিহার্য।" (সূত্র : সুনানু ইবনে মাজাহ্, ইফাবা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-১৬৭৬, পৃষ্ঠা-৯৫)।

(খ) যদি ঢেকুর তোলার সময় কোনো কিছু তার মুখে উঠে আসে তাহলে সেটাকে বাইরে ফেলে দিতে হবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ভিতরে ঢুকে যায় তাহলে তার রোযা সঠিক হবে।

(৫) ইনজেকশন :

(ক) শিরায় ইনজেকশন নিলে এবং মলদ্বারের ভিতরে তরল পদার্থ ঢোকানো হলে রোযা বাতিল হবে এবং রোযার কাযা আদায় করতে হবে। কিছু ফকীহ্র মতে, এ কাজ অপরিহার্য বা জরুরী কারণে না হলে কাফ্ফারাহ দিতে হবে।

(খ) তবে যেসব ইনজেকশন পেশীতে প্রবেশ করানো হয় কিম্বা অবশ করানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এবং তদ্রুপ ক্ষত ও কাটা ঘায়ে ঔষধ লাগানোর ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।

(৬) ঘনধুলা-বালি ও গাঢ় ঘন বাষ্প এবং স্প্রে বা গ্যাস :

(ক) ঘন ধূলিময় বায়ু শরীরে প্রবেশ করলে রোযা বাতিল হবে। যেমন- ময়দা বা এ জাতীয় অন্যকিছু মিশ্রিত বায়ু। যে গাঢ় বাষ্প মুখের ভিতরে পানিতে পরিণত হয় তা এবং সর্তকতামূলক ওয়াজিব হলো সিগারেট, তামাক ইত্যাদির ধোঁয়াও যেন গলার ভিতর প্রবেশ না করে।

(খ) রোযাদার যদি তীব্র শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্য নেওয়ার জন্য যদি ইনহেলার (স্প্রে হতে বের হওয়া গ্যাস) এর প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে ইনহেলারের গ্যাস খাদ্যনালীতে প্রবেশ না করে শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না ।

(গ) ব্রাশ ও টুথপেষ্ট দ্বারা দাঁত পরিস্কার করলে রোযা বাতিল হয় না, যতক্ষণ না দাঁত মাজার সময় থুথুর সঙ্গে মিশ্রিত মাজন গিলে নেওয়া হচ্ছে।

(৭) নিয়্যত ভঙ্গ করা :

কোন ব্যক্তি যদি রোযা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকেন, তাহলেও তার রোযা বাতিল হবে।

(৮) পানিতে মাথা ডোবানো :

রোযাদার ব্যক্তি শুধুমাত্র পুরো মাথা অথবা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে পুরো মাথা পানিতে ডোবালে রোযা বাতিল হবে। অর্থাৎ পানিতে ডুব দিয়ে গোসল করলে বা মাথা পানিতে ডুবালে রোযা ভঙ্গ হবে। এ জন্য রোযা

কাযা করতে হবে এবং কাফ্‌ফারাহ্‌ আদায় করতে হবে। তবে যদি তার সমগ্র দেহ পানিতে ডোবানো থাকে কিন্তু মাথার কিছু অংশ পানির বাইরে থাকে, তাহলে তার রোযা বাতিল হবে না।

(৯) ফজরের আযান পর্যন্ত অপবিত্র অবস্থায় থেকে যাওয়া :

ভোরের (ফজরের) আযান পর্যন্ত (সুবহে সাদিক হওয়া পর্যন্ত) জেনে বুঝে জানাবাত বা নাপাক অথবা হায়েয বা ঋতু কিংবা নিফাস বা রক্তশ্রাব অবস্থায় থাকলে রোযা বাতিল হয়ে যায়। চাই সেই রোযা রমযান মাসের হোক বা অন্য কোন কাযা রোযা হোক। কিন্তু অন্যান্য রোযার ক্ষেত্রে এ কারণে রোযা বাতিল হয় না। যদি কোন নাপাক ব্যক্তি কোন কারণবশতঃ ফজরের আযানের পূর্বে গোসল করতে না পারে তাহলে সে তায়াম্মুম করে রোযা রাখবে। আর যদি তায়াম্মুম না করে তাহলে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তাকে কাযা ও কাফ্‌ফারাহ্‌ দুই-ই আদায় করতে হবে।

(১০) মিথ্যা বলা :

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর নামে কোন মিথ্যা কথা বলেন তাহলে তার রোযা বাতিল হবে এবং এ জন্য তার ওপর কাযা এবং কাফ্‌ফারাহ্‌ দুই-ই বর্তাবে। আর সর্তকতামূলক ওয়াজিব অনুসারে হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা (আঃ), নবী-রাসূলগণ এবং তাদের স্থলাভিষিক্তগণের উপর মিথ্যা আরোপ করার বিধানও একই।

সেহ্‌রীর নিয়ম ও দোয়া :

'সাহ্‌রী' শব্দটি আরবী 'সাহারুন' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। রোযা রাখার উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে যে পানাহার করা হয় তাকে 'সেহ্‌রী' বলা হয়। সেহ্‌রী খাওয়া মুস্তাহাব। এর জন্য উপযুক্ত সময় হল রাত্রের শেষ ভাগ থেকে সুব্‌হি সাদিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

রোযাদার ব্যক্তি যদি সেহ্‌রী খাওয়া অবস্থায় বুঝতে পারেন যে, সুবহে সাদিকের সময় হয়ে গেছে তাহলে মুখে অবশিষ্ট লোকমা বের করে আনতে হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সেটা গিলে ফেলেন তাহলে তার রোযা বাতিল হবে। (সূত্র : রাহবারের দফতর থেকে ইস্তিফতা, রোযা অধ্যায়, মাসআলা-২২)।

এ সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মাদ শা'ফী (রঃ) বলেন,

সেহ্‌রী খাওয়ার শেষ সময় হচ্ছে, "সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুবহে সাদিক দেখা দেয়ার আগেই খানা-পিনা হারাম মনে না করা অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন না করা যে, সুবহে সাদিকের আলো ফুটে উঠার পরও খানা-পিনা করতে থাকবে। বরং খানা-পিনা এবং রোযার মধ্যে সুবহে সাদিকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমা রেখা উদয় হওয়ার পূর্ব

পর্যন্ত খানা-পিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন জায়েজ নয়, তেমনি সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার ব্যাপারে একীন (বিশ্বাস) হয়ে যাওয়ার পর খানা-পিনা করাও হারাম এবং রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ। তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুবহে সাদিক উদয় সম্পর্কে একীন হওয়া পর্যন্ত সেহ্‌রীর শেষ সময়। [সূত্রঃ তফসীর মাআরেফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শা'ফী (রঃ), বাংলা অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশক: সৌদি আরব সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়, পৃষ্ঠা-৯৫]।

সেহ্‌রীর দোয়া : (সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩৩১-৩৩২)।

يَا مَفْزَعِيْ عِنْدَ كُرْبَتِيْ وَيَا غَوْثِيْ عِنْدَ شِدَّتِيْ اِلَيْكَ فَزِعْتُ
وَبِكَ اسْتَغَثْتُ وَبِكَ لُذْتُ لَا اَلُوْذُ بِسِوَاكَ وَلَا اَطْلُبُ الْفَرَجَ
اِلَّا مِنْكَ فَاَغِثْنِيْ وَفَرِّجْ عَنِّيْ يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيْرَ وَيَعْفُوْ عَنِ الْكَثِيْرِ
اِقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيْرَ وَاعْفُ عَنِّي الْكَثِيْرَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا تُبَاشِرُ بِهٖ قَلْبِيْ وَيَقِيْنًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَنْ يُصِيْبَنِيْ اِلَّا مَا
كَتَبْتَ لِيْ وَرَضِّنِيْ مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِيْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا عُدَّتِيْ فِيْ
كُرْبَتِيْ وَيَا صَاحِبِيْ فِيْ شِدَّتِيْ وَيَا وَلِيِّيْ فِيْ نِعْمَتِيْ وَيَا غَايَتِيْ فِيْ رَغْبَتِيْ اَنْتَ
لِسَاتِرُ عَوْرَتِيْ وَاٰمِنُ رَوْعَتِيْ وَ الْمُقِيْلُ عَثْرَتِيْ فَاغْفِرْ لِيْ
خَطِيْئَتِيْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

(ইয়া মাফজায়ী ইনদা কুরবাতি, ওয়া ইয়া গাউসি ইনদা শিদ্দাতি ইলাইকা ফাজি'তু ওয়া বিকাসতাগাছতু ওয়া বিকা লুযতু লা আলুযু বিসিওয়াকা ওয়ালা আতলুবুল ফারাজা ইল্লা মিনকা ফাআগিছনি ওয়া ফার্‌রিজ আ'ন্নি ইয়া মাইইয়াক্বাবালুল ইয়াসির। ওয়া ইয়াফু আনিল কাসীরি ইক্ববাল মিন্নিল ইয়াসীরা ওয়া'ফু আন্নিল কাছিরা। ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ঈমানান তুবাশিরু বিহি ক্বালবি ওয়া ইয়াক্বীনান হাত্তা আ'লামা আন্নাহু লাইইউসিবানী ইল্লা মা কাতাবতা লী ওয়া রাদ্দিনী মিনাল আইশি বিমা ক্বাসামতা লী ইয়া আরহামার রাহিমীন। ইয়া উদ্দাতী ফী কুরবাতী ওয়া ইয়া সাহেবী ফী শিদ্দাতী ওয়া ইয়া ওয়ালিয়ী ফী নি'মাতী ওয়া ইয়া গায়াতী ফী রাগবাতী আনতাস সাতিরু আউরাতী ওয়াল আমিনু রাউআতী ওয়াল মুক্বীলু আসরতী ফাগফিরলী খাতীয়াতী। ইয়া আর হামার রাহিমীন।)

অর্থ : "হে বিপদে আশ্রয়দানকারী! এবং হে তীব্র বিপদে মুক্তিদানকারী! আমি তোমার কাছে ক্রন্দন করিতেছি। এবং যেটিই তোমার কাছে কাম্য, শুধুমাত্র তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং তুমি ব্যতীত কাহারও কাছে স্বচ্ছলতা কামনা করিনা। এবং ওহে ডাকে সাড়াদানকারী আমার ডাকে সাড়া দাও এবং আমার চাহিদাকে পূরণ কর। ওহে যে স্বল্পের বিনিময়ে গ্রহনকারী এবং বহু অপরাধকে ক্ষমাকারী। আমার কাছ থেকে স্বল্পকে গ্রহণ কর ও বহুকে ক্ষমা কর। কারণ তুমি নিঃসন্দেহে পরম ক্ষমাশীল ও দয়াবান। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি আকাঙ্ক্ষী তোমার উপর আমার বিশ্বাসকে আমার অন্তরে সরাসরি স্থাপন কর। এমনকি আমি জানিতে পারি উহা (ভাগ্যলিপি) যাহা আমার নসীবে লিখিয়াছ। সেইটি তোমার সন্তুষ্টি আমার জীবনধারণের জন্য, যাহা তুমি আমার ভাগ্যতে আমার জন্য লিখিয়াছ। হে দয়াবানদের মধ্যে পরম দয়াশীল এবং হে আমার বিপদে মুক্তিদানকারী। এবং হে আমার কঠিন সময়ের সাথী এবং হে আমার অপার নিয়ামতের অভিভাবক। এবং হে আমার আকুলতার শেষ বিন্দু। একমাত্র তুমি আমার দোষ ত্রুটি গোপনকারী এবং ভয়ভীতি হইতে নিরাপত্তা দানকারী এবং বিচ্যুতি থেকে নিস্কৃতিদানকারী। সুতরাং, আমার অন্যায় সমূহকে ক্ষমা করে দাও। ওহে সর্বাপেক্ষা ক্ষমাশীল।"

ইফতারের নিয়ম ও সময়সূচী

ইফতারের নিয়ম :

'ইফতার' শব্দটি 'ফাতার' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হলো- ভেঙ্গে ফেলা, চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। 'ইফতার' শব্দের আভিধানিক অর্থ রোযা ভংঙ্গ করা। শরীয়তের পরিভাষায়, সূর্যাস্তের পর যখন রাত আসবে দিন চলে যাবে তখন রোযাদার ব্যক্তির পানাহার করাকে 'ইফতার' বলে। প্রথমে নামায পড়ে তারপর ইফতার করা মুস্তাহাব। আর যদি কেউ অতিরিক্ত দূর্বল হয়ে যান অথবা অন্যরা

তার জন্য অপেক্ষায় থাকেন তা হলে নামাযের পূর্বে ইফতার করাতে কোন সমস্যা নেই। ইফতারের সময় নিজের বাসার বাইরে দাওয়াত বা কাজ না থাকলে বাসার কাজের লোক ও অধীনস্থসহ পরিবারের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ইফতার করা উত্তম।

পবিত্র ও হালাল জিনিস দিয়ে ইফতার করতে হবে এবং উত্তম হচ্ছে খেজুর দিয়ে ইফতার করা; রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, কারণ এতে রয়েছে বরকত। খেজুর না পেলে পানি দিয়ে যেন ইফতার করে। কারণ তা পবিত্র।" (তিরমিযী শরীফ, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং-৬৫৫, পৃষ্ঠা-৩৬)।

সাদাসিধা অথবা সহজে হজম হয় এমন খাদ্য দিয়ে ইফতার করা উত্তম। আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা স্রষ্টার একটি বড় নেয়ামত, আর সুস্থ থাকতে হলে নিজের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিজেকেই গ্রহণ করতে হবে। ইফতারে অতিরিক্ত খাবারের আয়োজন না করা। কোন অবস্থাতেই ইফতারে অপব্যয় না করা এবং বিলাসী মানসিকতা পরিহার করা। ইফতারে নানারকম সুস্বাদু খাবার না থাকলে নিজেকে দূর্ভাগ্য মনে না করা। এ ক্ষেত্রে সকল রোযাদারের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কথায় আছে, 'দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং ইমাম (আঃ) গণ সর্বদা অল্প খাবার দিয়ে ইফতার করতেন। আমরা ৭৬নং সূরা দাহর বা ইনসান এর ৫ থেকে ১০ নং আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে জানি যে, হযরত ইমাম আলী (আঃ), হযরত ফাতিমা (আঃ), ইমাম হাসান (আঃ), ইমাম হুসাইন (আঃ) এবং তাঁদের দাসী ফিয্যা মানতকৃত তিনদিনের রোযার ইফতারের সময় তিনদিন পরপর অভাবী, মিসকিন, এতিম ও বন্দী ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ইফতার দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধুই পানি দিয়ে ইফতার করেন এবং পরের দিনের রোযা রাখেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অবগত হওয়ার মুহূর্তে হযরত জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করলেন ও সূরা দাহর এর ৫ থেকে ১০ নং আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেন। (সূত্র : বিহারুল আনওয়ার, খন্ড-৩৫, পৃষ্ঠা-২৩৭)।

এখানে 'বিহারুল আনওয়ার' কিতাব থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই তা হলো, একদা হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হযরত আবূ যর গিফারী (রাঃ)-কে দাওয়াত করলেন এবং হযরত আবূ যর গিফারী (রাঃ) সেই দাওয়াত গ্রহণ করে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এর বাসায় গেলেন। খাওয়ার সময় সালমান ফারসী (রাঃ) কয়েকটি শুকনা রুটি থলে থেকে বের করে সেগুলোকে ভিজিয়ে নরম করে আবূ যর গিফারী (রাঃ) এর সামনে রাখলেন। আবূ যর গিফারী (রাঃ) বললেন, "এই রুটিতে যদি লবন থাকত তাহলে ভাল হত।" হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বাইরে গিয়ে তার পানির পাত্রটা বন্ধক রেখে

সামান্য লবণ নিয়ে আসলেন। আবূ যর গিফারী (রাঃ) রুটিতে লবণ ছিটিয়ে খাওয়ার সময় বললেন, "আল্লাহর দরবারে অশেষ শোকর যে তিনি আমাদেরকে অল্পে তুষ্ট থাকার তৌফিক দান করেছেন।" হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বললেন, "যদি আমাদের অল্পে তুষ্ট রাখতো তাহলে আমাকে পানির পাত্র বন্ধক রাখতে হত না।" (সূত্র : বিহারুল আনওয়ার খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-৩২১)।

শুধু ইফতারের সময় নয়, আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট থাকার মানসিকতার উন্নয়ন ঘটানো আবশ্যক।

রোযাদারকে ইফতার করানো এবং ইফতারের দোয়াঃ

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার দেয়, তাকেও রোযাদারের অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হবে।" [আল-কুলাইনী (মৃত্যু-৩২৯হিঃ), আল-কাফি, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৮, হাদীস-১]।

হযরত ইমাম মুসা কাজিম (আঃ) বলেছেন, "ইফতার দেয়া রোযাদার ভাইকে মুস্তাহাব রোযা থাকার চেয়েও উত্তম।" [সূত্র : আল-কুলাইনী (মৃত্যু-৩২৯হিঃ), আল-কাফি, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৮, হাদীস-২]। তাই সম্ভব হলে প্রতিদিন অন্তত একজন গরীব রোযাদারকে ইফতার করানো একটি উত্তম আমল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রোযাদারের দোয়া কখনো বিফলে যায় না।" (সূত্র : মুসনাদে আহমাদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭)।

রোযাদারদের দোয়া সম্পর্কে হযরত ইমাম মুসা কাজিম (আঃ) বলেছেন: "রোযাদার ব্যক্তির দোয়া ইফতারের সময়ে কবুল হয়।" (সূত্র : আল্লামা মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, খন্ড-৯২, পৃষ্ঠা-২৫৫, হাদীস-৩৩)।

রোযাদারের আনন্দ সম্পর্কে হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেছেন, "রোযাদারের জন্য সময় সম্পর্কে দু'টি সুখবর আছে, (এক) ইফতার করার সময়, (দুই) মারা যাওয়ার সময়।" (সূত্র : ওয়াসায়েলুশ শিয়া, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯০)।

নিম্নোক্ত দোয়াগুলি ইফতারের সময় পড়তে বলা হয়েছেঃ [সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-২৯২-৯৩, প্রকাশ-১৩৭৭ ফারসী সন, ১৯৯৮ইং, হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা (সাঃ আঃ) প্রকাশনী, কোম, ইরান।]

ইফতারের পূর্বে এ দোয়াটি পড়তে হবেঃ (সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-২৯২)।

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ .

(আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু, ওয়া আলা রিয্‌ক্বিকা আফতারতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু।)

অর্থ: "হে আল্লাহ্ তোমার জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমার রিযিক দ্বারা ইফতার করছি এবং তোমারই উপর ভরসা করছি।"

হযরত ইমাম আলী (আঃ) যখন ইফতার করতেন তখন এই দোয়াটি পড়তেন : (সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-২৯৩)।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

(বিসমিল্লাহি, আল্লাহুম্মা লাকা সুমনা, ওয়া আলা রিজ্‌ক্বিকা আফতারনা, ফাতা কাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম।)

অর্থ : "আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ আমরা তোমার জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দ্বারা ইফতার করছি; সুতরাং আমাদের থেকে তা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞানী।"

প্রথম লোকমা মুখে দেওয়ার সময় বলতে হবে : (সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-২৯৩)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اِغْفِرْلِىْ .

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইয়া ওয়াসিয়াল মাগফিরাতী ইগ্‌ফিরলী।)

অর্থ : "পরম করুণাময় অনন্ত আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। হে মহা-ক্ষমার অধিকারী আমাকে ক্ষমা কর।"

এছাড়া ইফতারের সময় সূরা আল-ক্বদর (৯৭নং সূরা) পড়া মুস্তাহাব।

ইফতারের সময়সূচী

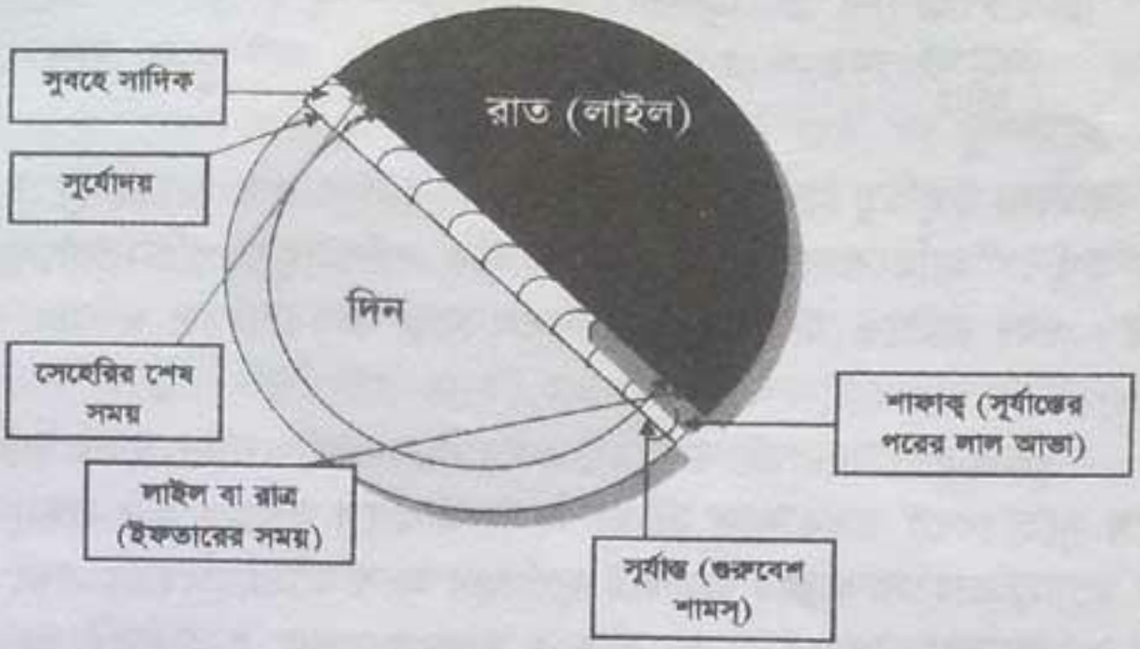

ইফতারের সময়সূচীর চিত্র

সেহ্‌রী ও ইফতারের সময়সূচী সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনে সুস্পষ্ট আয়াত (হুকুম) বিদ্যমান। যেমন ঃ সূরা আল-বাকারার, ১৮৭ নং আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে,

كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ

তোমরা খাও ও তোমরা পান কর যতক্ষণ না স্পষ্ট হয়ে যায় তোমাদের জন্যে রেখা সাদা (অর্থাৎ সুবেহ সাদেক) হতে

الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى

রেখা কাল (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার) ফজরে এরপর তোমরা পূর্ণ কর রোযা পর্যন্ত

الَّيْلِ ج

রাত্র

(কুলূ ওয়াশরাবূ হাত্তা ইয়াতাবাইয়ানা লাকুমুল খাইতুল আবইয়াদ্বু মিনাল খাইত্বিল আছওয়াদি মিনাল ফাজ্বরি, ছুম্মা আতিম্মুছ-ছিয়ামা ইলাল্লাইল।)

অর্থ : "আর তোমরা পানাহার কর, যে পর্যন্ত না তোমাদের কাছে ভোরের কাল রেখা থেকে সাদা রেখা প্রকাশ পায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৭)।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত না আসা পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করতে হবে। অথচ আমরা সন্ধ্যা আগমনের সাথে সাথেই আমাদের রোযা ভেঙ্গে ফেলি বা ইফতার করি (প্রায় ১৫ মিনিট আগে)। এখন কেউ হয়তো বলতে পারেন, সন্ধ্যা রাত্রির একটা অংশ, কিন্তু তা ঠিক নয়।

এ সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

অতএব না আমি শপথ করছি সন্ধ্যা লালিমার এবং রাতের ও যা সমাবেশ ঘটায়

(ফালা উক্বছিমু বিশ-শাফাক্বি। ওয়াল-লাইলি ওয়া মা ওয়াছাক্বা।)

অর্থ : "আমি শপথ করছি সূর্যাস্তকালীন লালিমাযুক্ত পশ্চিমাকাশের আর রাত্রির। এবং রাত্রিতে যা কিছুর সমাবেশ ঘটে তার।" (সূরা আল-ইন্‌শিক্বাক : ১৬-১৭)।

সূর্যাস্তকাল বা সন্ধ্যা বলা হয় গোধুলিকে অর্থাৎ যখন গরুর পাল ধূলি উড়িয়ে গৃহে ফেরে তখন লাল রং বা আভা আকাশে থাকে। যদি সন্ধ্যা রাত্রির অংশ হতো, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই সূর্যাস্তের লাল আভা (সন্ধ্যা) এবং রাত্রির শপথ আলাদাভাবে করতেন না। বরং এ ধরনের শপথ এ ইঙ্গিতই বহন করে যে, একটা শেষ হলে অন্যটার শুরু হয়। এটাই আল-কুরআনের বর্ণনার একটি বৈশিষ্ট্য, যা পবিত্র আল-কুরআনকে গৌরবমন্ডিত করেছে। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

"সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সূতরাং যে কেউ কাবা গৃহে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পন্ন করে, এ দুইটির মধ্যে (সাঈ') যাতায়াত করলে তার কোন পাপ নেই এবং কেউ স্বতঃস্ফুর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ পুরস্কারদাতা ও সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-বাকারা-১৫৮)।

এ আয়াতে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাঈ' বা দৌড়ানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সাফা থেকে সাঈ' শুরু করার কথা না থাকলেও সেটাই সুন্নাহ, সেটাই নিয়ম। আল্লাহ যেহেতু 'সাফা' শব্দটি আগে ব্যবহার করেছেন, তাই তাঁর রাসূল (সাঃ)ও সাঈ' করার সময় 'সাফা' থেকে শুরু করেছেন। একই ধারায় মহান আল্লাহ কর্তৃক পরপর 'সূর্যাস্তকালীন লাল আভা' ও 'রাত্রির শপথ' করা এটাই প্রমাণ করে যে, আগে সূর্যাস্তকালীন লাল আভার আগমন ঘটে ও তা মিলিয়ে গেলেই রাত্রির আগমন ঘটে। আর এ রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করার নির্দেশ আল-কুরআনে দেয়া হয়েছে।

উপরে ইফতারের সময়সূচী চিত্রে অংকিত তীর চিহ্নই পবিত্র আল-কুরআনে বর্ণিত রোযার সময়সূচী, যা 'সুবহে সাদিক'-এর পূর্ব থেকে শুরু হয় এবং 'শাফাক্ব'-এর পূর্ণ পরিসমাপ্তির পর 'লাইল'-এ অর্থাৎ রাতের শুরুতে শেষ হয়, যা শাফাক্ব বা সূর্যাস্ত পর্যন্ত নয়। পবিত্র কুরআনের আদেশ অনুযায়ী সূর্যাস্তের পরের 'শাফাক্ব' (লাল আভা)-এর সময় ইফতার করা বৈধ নয়।

ইফতারির সময় সম্পর্কে যেমন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ বা দ্বিধা-বিভক্তির সৃষ্টি না হয় তার সকল প্রমাণ, দলিল এবং ব্যাখ্যা পবিত্র আল-কুরআনেই বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ্ দিবা-রাত্র এবং মধ্যবর্তী বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দমালা ব্যবহারের মাধ্যমে সেই সকল সময়কে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন: 'লাইল' অর্থ রাত্র, তা কুরআনে ১৬২টি স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলা ভাষাতেও 'লাইল' অর্থ যে রাত বুঝায় তা বহুল প্রচলিত একটি বাক্য। যেমন: প্রত্যেকটি মুসলমান 'লাইলাতুল বারাত' (ভাগ্য রজনী), 'লাইলাতুল ক্বদ্‌র' (মহিমান্বিত রজনী) শব্দের সাথে পরিচিত এবং তারা 'লাইল' অর্থ কোন ভাবেই সন্ধ্যাকে বা সূর্যাস্তের সময়কে মনে করেন না। তদ্রুপ আল্লাহ্ অপরাহ্ন বলতে 'নাহার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পবিত্র আল-কুরআনে বিকালের সময় সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা আল-আছ্‌র রয়েছে, সন্ধ্যা সম্পর্কে 'আছিল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, প্রভাতকাল সম্পর্কে সূরা-মুদাচ্ছিরের ৩৪ নং আয়াতে 'সুব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সূর্যাস্তের সময়কে পবিত্র আল-কুরআনে 'গুরুবেশ শামস' (সূর্যাস্ত) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে যে রক্তিম আভার সৃষ্টি হয় এবং যা প্রায় ১৮ থেকে ২৬ মিনিট বিদ্যমান থাকে সেই সময়কে সূরা-ইনশিক্বাক্ব -এর ১৬ নং আয়াতে 'শাফাক্ব' (লাল আভা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং 'শাফাক্বের' পূর্ণ পরিসমাপ্তির পরেই যে 'লাইল' বা রাতের শুরু হয় তাও সূরা-ইনশিক্বাক -এর ১৬ এবং ১৭ নং আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

যেন রাত সম্পর্কে বা রাত্রির ব্যাখ্যা সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যেও কোন রকম সন্দেহের অবকাশ না থাকে সে জন্যে পরমকরুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন রাতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা তার কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করব।

সূরা-বনি ইসরাইলের ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

جَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ

আমরা করেছি — রাতকে — ও — দিনকে — দুটি নিদর্শন — অতঃপর আমরা নিষ্প্রভ করেছি — নিদর্শনকে — রাতের

(জ্বা'আলনাল লাইলা ওয়ান-নাহারা আইয়াতাইনি ফামাহাওনা আইয়াতাল লাইলি।)

অর্থ : "আর আমি রাত্রি ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। রাত্রির নিদর্শনকে করে দিয়েছি নিস্প্রভ এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল।"

রাতের ব্যাখ্যায় পবিত্র আল-কুরআনের সূরা-ইয়াসিনের ৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

وَ	اٰيَةٌ	لَّهُمُ	الَّيۡلُ	نَسۡلَخُ	مِنۡهُ	النَّهَارَ
এবং	(আরো) একটি নিদর্শন	তাদের জন্যে	রাত	অপসারিত করি আমরা	তা থেকে	দিনকে

فَاِذَا	هُمۡ	مُّظۡلِمُوۡنَ ﴿۳۷﴾	
অতঃপর তখন	তারা	অন্ধকারাচ্ছন্ন (হয়ে যায়)	

(ওয়া আইয়াতুল লাহুমুল্লাইলু নাছলাখু মিনহুন্নাহারা ফাইযা হুম মুযলিমূন।)

অর্থ : "আর তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন হল রাত, আমিই তার উপর থেকে দিনকে অপসারিত করি, ফলে তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।"

وَ	النَّهَارِ	اِذَا	جَلّٰىهَا ﴿۳﴾	وَ	الَّيۡلِ	اِذَا	يَغۡشٰىهَا ﴿۴﴾	
শপথ	দিনের	যখন	তাকে প্রকট করে	শপথ	রাতের	যখন	তাকে আচ্ছাদিত করে	

(ওয়ান্নাহারী ইযা জ্বাল্লাহা। ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগশাহা।)

অর্থ : "দিনের শপথ! যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে। রাতের শপথ! যখন সে সূর্যকে ঢেকে ফেলে বা আচ্ছাদিত করে।" (সূরা-আশ শামস্ : ৩-৪)

সূরা-লাইল এর ১-২নং আয়াতে বলা হয়েছে:

وَ	الَّيۡلِ	اِذَا	يَغۡشٰى ﴿۱﴾	وَ	النَّهَارِ	اِذَا	تَجَلّٰى ﴿۲﴾
	আলোকিত হয়	যখন	দিনের	শপথ	আচ্ছন্ন করে	যখন	রাতের	শপথ

(ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা। ওয়ান্নাহারি ইযা তাজ্বাল্লা।)

অর্থ : "রাত্রির শপথ যখন তা আচ্ছন্ন করে নেয়, শপথ দিনের যখন তা উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।"

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা রাতের ব্যাখ্যা সূরা-দোহার ১-২ নং আয়াত :

وَ	الضُّحٰى ﴿۱﴾	وَ	الَّيۡلِ	اِذَا	سَجٰى ﴿۲﴾
	অন্ধকারাচ্ছন্ন	যখন	রাতের	শপথ	উজ্জ্বল দিনের	শপথ

(ওয়াদ্-দুহা। ওয়াল্লাইলি ইযা ছাজ্বা)

অর্থ : "কসম পূর্বাহ্নের, আর কসম রাত্রির, যখন তা নিঝুম-নিস্তব্ধ হয়।"

রাতের ব্যাখ্যা সূরা আল-ফুরকানের : ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ

এবং তারা বলে (এই কোরআন) পূর্বকালের উপকথার সমাহার তা সে লিখিয়ে নিয়েছে তা অতঃপর

تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ۝

তনান হয় তার নিকট সকালে ও সন্ধ্যায়

(ওয়া ক্বালূ আছাত্বীরুল আউওয়ালীনাক-তাতাবাহা ফাহিয়া তুমলা আলাইহি বুকরাতাও ওয়া আছীলা।)

অর্থ : "তারা আরও বলে যে, এ কুরআন তো পুরাকালের কল্পকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে, তারপর তা সকাল-সন্ধ্যায় তাকে পাঠ করে শুনানো হয়।"

আল্লাহ্ নামাযের সময়সূচী সম্পর্কে উল্লেখ করতে যেয়েও সুস্পষ্ট রাতের শব্দমালা ব্যবহার করেছেন। সূরা-বনি ইসরাইলের ৭৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ

কায়েম কর নামায ঢলে পড়ার সময়থেকে সূর্য ঘন অন্ধকার পর্যন্ত এবং রাতের ফজরের নামাজ (কোরআন পাঠ)

(আক্বিমিছ ছালাতা লিদুলূকিশ শামছি ইলা গাছাক্বিল লাইলি ওয়া কুরআনাল ফাজ্বর।)

অর্থ : "সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের নামাযও কায়েম কর।"

সূরা-নূরের-৩৬ ও ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ۝

তসবিহ করে (তারা) তাঁরই তার মধ্যে সকালসমূহে ও সন্ধ্যাসমূহে

(ইয়ুছাব্বিহু লাহূ ফীহা বিলগুদুব্বি ওয়াল আছালি।)

অর্থ : "সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।"

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ

আবর্তন ঘটান আল্লাহ রাতকে ও দিনকে

(ইয়ুক্বাল্লিবুল্লাহুল লাইলা ওয়ান-নাহার;)

অর্থ : "আল্লাহ রাত্রি ও দিনের পরিবর্তন ঘটান।"

সূরা-নাযিআতের ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰهَا ﴿٢٩﴾

এবং	অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন	তার রাত	এবং	বের করেছেন	তার দিবালোক

(ওয়া আগত্বাশা লাইলাহা ওয়া আখ্‌রাজ্বা দুহাহা।)

অর্থ : "আর তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারময় এবং এর দিনকে করেছেন আলোকময়।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'লাইল' বা রাত হলো এমন একটি সময় যা পরিপূর্ণ বা সম্পূর্নরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন। যেখানে দিনের আলোর উপস্থিতির কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। 'লাইল' বা রাত, 'শাফাক্ব' (লাল আভা), 'গুরুবেশ শামস' (সূর্যাস্ত), 'আছ্‌র' বা 'আছিল' (সন্ধ্যা) নয়। তাই পবিত্র কুরআনে নির্ভুল স্রষ্টা আল্লাহ্ কখনোই ভুল করে 'লাইল' (রাত) শব্দ ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ 'আছিল' বা সন্ধ্যায় ইফতার করতে হবে এ মতামত কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ্ আমাদেরকে রোযা রাত্রি (লাইল) পর্যন্ত পূর্ণ করার আদেশ বা হুকুম দিয়েছেন, 'শাফাক্ব' বা 'গুরুবেশ শামস'-এ নয়, যা উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

এখন যদি আমরা কুরআনিক ব্যাখ্যার সাথে সাথে হাদীসের সহায়তা গ্রহণ করি তা থেকেও প্রমাণিত হয় যে আমাদেরকে রোযা রাত্রি পর্যন্ত পূর্ণ করতে হবে। যেমন:

হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, "উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রাঃ) এবং উসমান ইব্‌নে আফ্‌ফান (রাঃ) উভয়ে মাগরিবের নামাজ পড়তেন, এমন সময় তখন তাঁরা রাত্রির অন্ধকার দেখতে পেতেন। আর তা হতো ইফতার করার পূর্বে। অতঃপর তাঁরা উভয়ে ইফতার করতেন। আর তা হতো রমযান মাসে।" [সূত্র : মুয়াত্তা, ইমাম মালিক (রঃ), ইফাবা, প্রথম খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, রোযা অধ্যায়, হাদীস নং ৮, পৃষ্ঠা-৩৫৮]।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন রাত সে দিক থেকে ঘনিয়ে আসে ও দিন এ দিক থেকে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন রোযাদার ইফতার করবে।" (সূত্র : বুখারী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, হাদীস নং-১৮৩০, পৃষ্ঠা-২৬৭)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমরা এদিক (পূর্বদিক) হতে রাত্রির আগমন দেখতে পাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।" (বুখারী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, হাদীস নং-১৮৩৪, পৃষ্ঠা-২৬৯)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন রাত আসে, দিন চলে যায় এবং সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন রোযা পালনকারী ইফতার করবে।" (সূত্র : মুসলিম শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-২৪২৫, পৃষ্ঠা-৪২০; তিরমিযী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-৬৯৬, পৃষ্ঠা-৭০)।

সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "সর্বদা লোক মঙ্গলের উপর থাকবে যতদিন ইফতার সত্ত্বর করবে।" (সূত্র : মুয়াত্তা, ইমাম মালিক (রঃ), ইফাবা, প্রথম খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, রোযা অধ্যায়, হাদীস নং ৬, পৃষ্ঠা-৩৫৭)।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, লোকেরা যতদিন ওয়াক্ত হওয়া মাত্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।" (সূত্র : বুখারী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, হাদীস নং-১৮৩৩, পৃষ্ঠা-২৬৮)।

এ হাদীসে ইফতারের সঠিক সময় হলে বিলম্ব না করে ইফতার করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তা হতে হবে মাগরিবের ওয়াক্ত হওয়ার পর। নির্ধারিত সময়ে পানাহার না করাটাই হলো রোযা। ইফতারী না খেলেও বা দেরীতে খেলেও রোযা হবে। কিন্তু শারীরিক কষ্ট হবে। তাতে কোন কল্যাণ নেই। যেমন- সেহ্রী না খেয়েও রোযা থাকা যায়। তাতে শারীরিক কষ্ট হয়, এতে কোন কল্যাণ নেই। সেহ্রী খাওয়ার ফলে রোযাদার ব্যক্তির রোযা রাখার জন্য শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মন প্রফুল্ল থাকে। আর সেহ্রী খাওয়ার অন্তর্নিহিত বরকত হচ্ছে ঐ সময়ে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত অবর্তীণ হয় এবং তখন দু'আ কবুলের সময়। আর 'সেহ্রী' হচ্ছে রোযাদার ব্যক্তি অর্ধরাত্রের পর হতে সুবহি সাদিক পর্যন্ত সময়ে রোযার নিয়্যতে যে খানা খায়। সেহ্রী খাওয়া মুস্তাহাব। সেহ্রী সম্পর্কে রাসূলুল্লা (সাঃ) বলেছেন,

"তোমরা সেহ্রী খাও, কেননা সেহ্রীতে বরকত রয়েছে।" (সূত্র : বুখারী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, হাদীস নং-১৮০১, পৃষ্ঠা-২৫০)।

এ সহীহ্ হাদীসগুলি দ্বারা কোন ভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, সূর্যাস্তের 'আছিল' (সন্ধ্যা) সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে। উপরে উল্লেখিত, পবিত্র আল-কুরআনের আয়াতসমূহ এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীসসমূহের আলোকে এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদেরকে রোযা রাত্রি পর্যন্ত পূর্ণ করতে হবে।

যারা মনে করেন, "রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে, যখন দিনের শেষ ভাগে পূর্ব দিগন্ত থেকে রাতের আঁধার ওপরের দিকে উঠতে থাকে তখন ইফতারের সময় হয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর অযথা দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষায় বসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ যেখানে রাতের সীমানা শুরু হচ্ছে সেখানে রোযার সীমানা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর রাতের সীমানা শুরু হয় সূর্যাস্ত থেকে। কাজেই সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা

উচিত। আরো যদি বলা হয়, সেহ্‌রী ও ইফতারে উভয় ব্যাপারে অত্যধিক সর্তকতার বা কড়াকড়ি করা ঠিক নয় এবং শরীয়ত ঐ দু'টি সময়ের ব্যাপারে এমন কোন সীমানা নির্ধারণ করে দেয়নি যে তা থেকে কয়েক মিনিট এদিক ওদিক হয়ে গেলে রোযা নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা বিলম্বে ইফতার করা মাকরুহ।" এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, রোযা ভঙ্গ করার 'শাফাক্ব' বা সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা আর 'লাইল' অর্থাৎ রাত পর্যন্ত নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে স্বীয় মতকে প্রাধান্য দেয়া এবং স্পষ্ট বর্ণনাসমূহ থাকা সত্ত্বেও এহ্‌তিয়াতের (সাবধানতা) আশ্রয় গ্রহণ না করে ইজতিহাদের আশ্রয় গ্রহণ কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা আমাদেরকে ভাবতে হবে। বিশেষ করে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের আদেশ বা হুকুমকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না, বা জেনেও না জানার ভান করা, বা অনুসরণ না করার কোন পথই মুসলমানদের জন্য খোলা নেই। নামাযের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগে নামায আদায় করলে যেমন নামায সহীহ হবে না, ঠিক তেমনি রোযার ক্ষেত্রেও। এ ক্ষেত্রে আমাদের সর্বদা এহ্‌তিয়াত (সাবধানতা) এর আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার।

যদি সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নাহ হয়ে থাকে, তাহলে 'ইমামীয়া বা জাফরী মাযহাব' এর লোকেরা সেই সুন্নাহ মানছে না- যদিও তাদের রোযা হয়ে যায়। আর দেরী করে ইফতার করা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নাহ হয়ে থাকে, তাহলে 'জাফরী মাযহাব' এর লোকেরা সঠিক কাজ করছেন, আর অন্যেরা করছে উল্টোটি। আর 'ইমামীয়া বা জাফরী মাযহাব' এর সময়সূচী যদি ইফতারের প্রকৃত সময়সূচী হয়ে থাকে, তাহলে সময়ের আগে যারা ইফতার করে রোযা ভঙ্গ করে তাদেরতো রোযাই হওয়ার কথা নয়। ইসলাম যেহেতু সত্য ধর্ম-তাই এর মৌলিক কোন ধর্মীয় অনুশাসনের বিষয়ে দুইটা সঠিক মত বা পথ থাকতে পারে না। আল্লাহ বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ তোমরা 'আল্লাহ' এর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর 'আল্লাহর রাসূল (সাঃ)' এর এবং 'উলিল আমর'-দের এবং যদি কোন ব্যাপারে তোমাদের মত বিরোধ হয় তাহলে তোমরা তা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাসী হও। ইহাই উত্তম ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" (সূরা নিসা, আয়াত নং-৫৯)।

মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে একজন মানুষের উপর ফরয হয়ে যায় যে, একমাত্র পবিত্র আল-কুরআনই মানবজীবনের তথা সৃষ্টিসমূহের সঠিক ও নির্ভূল কর্মপন্থার মাপকাঠি বলে বিশ্বাস করা। আল-কুরআনের বিধি-বিধানের মূল স্পিরিট পূর্ণরূপে অনুধাবন ও তা আমলে রূপান্তর করার উপলব্ধির জন্য অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে কুরআনের শব্দচয়ন ও ব্যবহার এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, গবেষণালব্ধ, যৌক্তিক ও প্রতিষ্ঠিত চিন্তার উপর। আল-কুরআনের বিধানসূহকে সঠিকভাবে জানার উপর নির্ভর করে আল-কুরআন থেকে প্রকৃত হেদায়েত লাভ। আর বিশেষ করে আল-কুরআন ও ইসলামের

বিধি-বিধানের ব্যাখ্যার জন্য সহীহ হাদীসের বিধান অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দলিল। এ দলিল ব্যতিরেকে ইসলামের শিক্ষাকে উপলব্ধি বা অনুধাবন করতে পারার যে কোন দাবী একটি অন্তঃসারশূন্য শ্লোগান বা ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সত্য অনুসন্ধানের ইচ্ছা থাকা। ধর্মের অর্থ হলো ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং সেই অনুযায়ী আমল করা। ইসলামের জীবন বিধানের সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং সে অনুযায়ী আমল দ্বারা নিজেকে একজন প্রকৃত মুসলমান হিসেবে রূপায়িত করা। আর ঐশী শিক্ষাকে সে-ই অবনত মস্তকে গ্রহণ করতে পারে যার মধ্যে সচেতনতা ও সত্যান্বেষী মনোবৃত্তি নিহিত আছে। সূরা ইয়াসীন এর ৭০নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যাতে তিনি (রাসূল) সচেতনদের সর্তক করতে পারেন।" সূরা আল-বাকারা- ১৮১নং আয়াতে বলা হয়েছে, "অতঃপর ইহা (অর্থাৎ কুরআন) শোনার পর যদি কেউ তা পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করবে অপরাধ তাদেরই।" সূরা সাবা এর ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে- "আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

ইফতারের ব্যাপারে অন্যকে অনুসরণ করা 'তাকিয়া' এর অন্তর্ভূক্ত নয় :

বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে বা অন্য কোন ইফতার পার্টিতে মুকাল্লাফ (অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি) রোযাদার ব্যক্তির জন্য ইফতারের সময় শুরুর ব্যাপারে অন্যকে (যেমন-আহলে সুন্নাতের ইফতারের সময়সূচী) অনুসরণ করা জায়েজ নয় এবং একাজ 'তাকিয়া' এর অন্তর্ভূক্ত নয়। 'তাকিয়া' অর্থ সতর্কতা, ভীতি, গোপনীয়তা অবলম্বন। পারিভাষিক অর্থে অবস্থার চাপ অথবা ক্ষতি এড়াবার জন্য ধর্মীয় কর্তব্য হতে সাময়িক অব্যাহতি লাভের উপায়। 'তাকিয়া' শব্দটি 'ওয়াকাইয়া' মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ ঢাল, যার আশ্রয়ে মানুষ নিজেকে আড়াল করে বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পায়। অর্থাৎ নিজের আকিদা-বিশ্বাস প্রকাশ হলে জীবনের হুমকী আসতে পারে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নিজের আকিদা-বিশ্বাসের কথা গোপন রাখা। তবে ইফতারের সময় আমরা কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে বলতে পারি, "আমি 'জাফরী ফিকহ' অনুসরণ করি। আমাদের ফিকহ্ অনুযায়ী আপনাদের চেয়ে প্রায় ১৫ (পনের) মিনিট পর আমাদের ইফতারের সময় শুরু হয়।" আমাদেরকে আগত পরিস্থিতির জন্য ইফতার শুরুর পূর্ব থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। দ্বীন ইসলামের একজন্য অকুতোভয় (ভয়হীন, নির্ভীক) সৈনিক হিসাবে আমাদের মনে রাখতে হবে পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্য। তাই আমি সাহসী, আমি নির্ভীক। আর সুদৃঢ় সংকল্প, সিদ্ধান্ত ও প্রত্যয় মানুষের শারীরিক শক্তিকে কয়েক গুন বৃদ্ধি করে দেয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

বলেন, "যেমনভাবে আত্মার সাথে শরীর স্থির রয়েছে, ঠিক সৎ নিয়্যতের সাথে দ্বীন সুদৃঢ় রয়েছে।" (সূত্র : বিহারুল আনওয়ার, খন্ড-৭৮, পৃষ্ঠা-৩১২)।

ইফতারের মাসআলা :

(১) কোন রোযাদার রাত হয়েছে অর্থাৎ ইফতারের সময় হয়েছে মনে করে (নিজ জ্ঞান বা বিশ্বাস থেকে) ইফতার করে ফেলে অতঃপর প্রতীয়মান হয় যে, ইফতারের সময় তখন হয়নি, তার ওপর ঐ দিনের রোযার কাযা ওয়াজিব নয়।

(২) কোন ব্যক্তি যার কথা শারয়ীভাবে গ্রহণযোগ্য (হুজ্জাত) সে যদি বলে যে রাত হয়েছে অর্থাৎ ইফতারের সময় হয়েছে এবং ইফতার করে অতঃপর প্রতীয়মান হয় যে, তখনো ইফতারের সময় হয়নি তাহলে ঐ দিনের রোযা কাযা আদায় করতে হবে।

(৩) কোন ব্যক্তি যার কথায় বিশ্বাস নেই, সে যদি বলে যে রাত হয়েছে অর্থাৎ ইফতারের সময় হয়েছে এবং ইফতার করে অতঃপর প্রতীয়মান হয় যে, তখনো ইফতারের সময় হয়নি তাহলে ঐ দিনের রোযা তার ওপর কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

(৪) আযানের সাথে ইফতারের কোন সম্পর্ক নেই।

রমযানের রাতের নামায

(সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩০২, ৩৫৮)

'জাফরী ফিকাহ' মোতাবেক রমযানের রাতগুলোতে মোট ১০০০ (একহাজার) রাকআত নামায পড়া মুস্তাহাব (অনুমোদিত)। কিন্তু এ নামাযগুলো জামায়াতে আদায় করা বেদআত। এ নামাযগুলো ব্যক্তিগতভাবে (একাকী) অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে (ফোরাদা) মসজিদে এবং অধিকাংশ সময় গৃহে আদায় করতে হবে। রমযানের এ নামায পড়ার নিয়ম হলো প্রথম দশদিন (রমযানের রহমাতের ১০দিন) এবং দ্বিতীয় দশদিন (রমযানের মাগফিরাতের ১০দিন) প্রতি রাত্রে ২০ রাকাত করে নামায পড়তে হবে। মাগরিবের নামাযের পরে ৮ রাকাত ও এশার নামাযের পরে ১২ রাকাত। তৃতীয় দশদিন (রমযানের নাজাতের শেষ ১০দিন) প্রতি রাতে ৩০ রাকাত করে নামায পড়তে হবে। মাগরিবের পর ৮ রাকাত এবং এশার নামাযের পর ২২ রাকাত। এভাবে হলো মোট ৭০০ রাকাত। বাদ বাকি ৩০০ রাকাত শবে ক্বদরের রাতসমূহে পড়তে হবে। অর্থাৎ ১৯ রমযানের রাতে ১০০ রাকাত, ২১ রমযানের রাতে ১০০ রাকাত এবং ২৩ রমযানের রাতে ১০০ রাকাত। এসব নামায দুই রাকাত করে পড়তে হবে।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত মহানবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, "কোনো ব্যক্তির জন্যে গৃহে সুন্নাত নামায পড়া মসজিদের নামায পড়ার চেয়ে উত্তম এবং ওয়াজিব নামাযগুলো মসজিদে আদায় করা মুস্তাহাব। [সূত্র : শেইখ তুসী (মৃত্যু- ৪৬০হিঃ); খেলাফ কিতাবুস সালাত, মাসয়ালা-২৬৮]।

জামায়াতবদ্ধ হয়ে তারাবীর নামায আদায় করার ব্যাপারটি 'আহলে সুন্নাত'-এর মধ্যে প্রচলিত। রমযান মাসে এশার নামাযের ফরয ও দুই রাকাত সুন্নাতের পর এবং বিতর নামাযের পূর্বে তারা যে নামায আদায় করেন তাকে 'সালাতুল তারাবী' বা 'তারাবীর নামায' বলে অভিহিত করা হয়। এটাকে ব্যক্তিগত মতের (ইজতিহাদ বে-রায়) মাধ্যমে বৈধতা দান করা হয়েছে। আর তাই তাদের কিতাবে একে 'বিদ'আতে হাসানা' বা 'সুন্দর বিদ্'আত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বিদ্'আত হচ্ছে ঐ মত, বস্তু বা কর্মপ্রণালী যার অনুরূপ কোন কিছু পূর্বে বর্তমান ছিল না বা সম্পাদন করা হয় নাই; অর্থাৎ নব প্রবর্তন বা অভিনবত্ব। ধর্মের স্বীকৃত উৎসগুলির (উসুল) সহিত যে সকল নুতন বিষয় যা ধর্ম ও নৈতিক বিশ্বাসের সাথে তার কোন সামঞ্জস্য নেই বা মুসলিম সমাজে যে সব নুতন ধারণা ও রীতিনীতির উদ্ভব হয় যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবন-যাপন প্রণালীর সাথে খাপ খায় না তা বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যা ব্যক্তিগত ও স্বাধীন মতও বটে।

নিম্নের হাদীসসমূহের আরবী পাঠের প্রতি মনোযোগ দিলে দেখা যায়, আরবী 'জওফ' এর মাধমে মধ্যবর্তী রাতের প্রতি একটি ইঙ্গিত করা হয়েছে (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায)। এ নামাযের জন্য রাসূল (সাঃ) মধ্যরাতে বের হন, তবে তা এশার নামায আদায়ের ঠিক পরপর নয়। আবার এ নামাযকে 'সালাতুল লাইল' বলা হয়েছে। হাদীসে 'তারাবীহ' শব্দের ব্যবহার নেই। 'তারাবীহ' শব্দটি 'তারাবিহাতুন' শব্দের বহুবচন এর মূল ধাতু 'রাহাতুন' অর্থ আরাম বা বিশ্রাম। যেহেতু তারাবী নামাযের মধ্যে প্রত্যেক চার রাকাত আদায় করে অল্প কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেয়া হয়, সেজন্যে এ নামাযকে হয়তো আরাম বা বিশ্রামের নামায বলে অভিহিত করা হয়েছে।

নিম্নের হাদীসসমূহ তার স্বাক্ষী :

একদিন রমযানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গভীর রাতে গৃহ থেকে বের হয়ে মসজিদে নামায আদায় করেন, কিছুসংখ্যক পুরুষ তাঁর পিছনে নামায আদায় করেন। সকালে লোকেরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেন, ফলে দ্বিতীয় দিন লোকেরা অধিক সংখ্যায় সমবেত হন। তিনি (রাসূল সাঃ) সালাত আদায় করেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। সকালে তাঁরা এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তৃতীয় রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বের হয়ে সালাত আদায় করেন ও লোকেরা তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংকুলান হল না, কিন্তু তিনি রাতে আর বের না হয়ে ফজরের নামাযের জন্য বেরিয়ে আসলেন এবং নামায শেষে লোকদের দিকে ফিরে প্রথমে তাওহীদ ও রিসালতের স্বাক্ষ্য দেওয়ার পর বললেন: "শোন! তোমাদের গতরাতের অবস্থান আমার অজানা ছিল না, কিন্তু আমি এ নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবার আশংকা করছি বিধায় বের হইনি। কেননা তোমরা তা আদায় করায় অপারগ হয়ে পড়তে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হলো আর এই ব্যাপারটি এভাবেই থেকে যায়।" (সূত্র : বুখারী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ১৮৮৫নং হাদীস, পৃষ্ঠা-২৯২)।

ইবনে শিহাব (যুহরী) (রঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পরও তারাবীর অবস্থা এরূপই ছিল। আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খিলাফতকালে এবং উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে (তারাবীর) অবস্থা অনুরূপই ছিল।" (সূত্র : মুয়াত্তা, ইমাম মালিক (রঃ), ইফাবা, প্রথম খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, রমযানের নামায অধ্যায়, হাদীস নং-২, পৃষ্ঠা-১৭০)।

আবদুর রহমান ইবনে আবদিল কারিয়্যু (রঃ) বলেছেন: আমি মাহে রমযানে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর সহিত মসজিদের দিকে গমন করিয়াছি, সেখানে গিয়া দেখি লোকজন বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কেউ একা নামায পড়িতেছেন। আবার কেউবা নামায পড়িতেছেন কিন্তু তাঁর ইমামতিতে একদল লোকও নামায আদায় করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া উমর (রাঃ) বলিলেন: আমি মনে করি যে, কত ভালই না হইত যদি এই মুসল্লিগণকে একজন ক্বারীর সহিত একত্র করিয়া দেওয়া হইত! অতঃপর তিনি উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর ইমামতিতে একত্র করিয়া দিলেন। আবদুর রহমান বলেন: দ্বিতীয় রাতেও আমি তাঁহার সহিত মসজিদে গমন করিলাম। তখন লোকজন তাঁহাদের ক্বারীর ইকতিদায় নামায পড়িতে ছিলেন। উমর (রাঃ) ইহা অবলোকন করিয়া বলিলেন: "ইহা অতি চমৎকার বিদ'আত বা নূতন পদ্ধতি।" (সূত্র : মুয়াত্তা, ইমাম মালিক (রঃ), ইফাবা, প্রথম খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, রমযানের নামায অধ্যায়, হাদীস নং ৩, পৃষ্ঠা-১৭০; বুখারী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ১৮৮৩ নং হাদীস, পৃষ্ঠা-২৯২)।

তাহাজ্জুদ নামায

'তাহাজ্জুদ' শব্দটি 'তাফাউল' শব্দের মাস্‌দার। এর মূল অর্থ নিদ্রা। কিন্তু উক্ত বাব এর বিশেষত্ব অনুযায়ী 'তাহাজ্জুদ' অর্থ জাগরিত থাকা, জাগরণী পালন করা, রাত্রে নামায আদায় করা অথবা কুরআন পাঠ করা। তবে তাহাজ্জুদ এর অর্থ নিদ্রা ভঙ্গ করে উঠা অধিক পরিচিত। সুতরাং রাতে তাহাজ্জুদ করার অর্থ হচ্ছে রাতের এক অংশে ঘুমাবার পর উঠে নামায পড়া। মুস্তাহাব নামাযসমূহের মধ্যে তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে আল-কুরআন এবং হাদীসে অধিক পরিমাণে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য এ নামায ওয়াজিব ছিল। তিনি নিয়মিত রাতের একটি অংশ ব্যয় করতেন তাহাজ্জুদ নামায আদায়ে। এ সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

"আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে, ইহা তোমার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমূদে)।" (সূরা বনী ইসরাইল-৭৯)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত, "আল্লাহর কোন বান্দা যখন নাকি রাত্রের শেষ-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ রাত্রের দু'অংশ অতিক্রম হওয়ার পর তার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করে তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে, তাহলে আল্লাহর ঐ বান্দার কায়া ও ক্বদরে তাঁর সন্তুষ্টি লিখে দিবেন।" (সূত্র : লেয়ালিউল আখবার, ৪র্থ খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)।

৬ষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সাদিক (আঃ) থেকে বর্ণিত, "মিথ্যাবাদী সেই যে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে অথচ সন্দেহ করে দারিদ্রতা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। কেননা তাহাজ্জুদ নামায দিনের রুজির জামানত প্রদানকারী।" [সূত্র : মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে বাবাভেই (শেইখ সাদুক), মৃত্যু-৩৮১ হিঃ, মান লা ইয়াহ্দারুল ফাকিহ, ১ম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা]।

রাতের প্রথমাংশে ঘুমিয়ে থাকা এবং শেষ অংশকে ইবাদাত দ্বারা প্রাণবন্ত রাখা একটি উত্তম আমল। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে রাতের প্রথমাংশে বললেন, "এখন ঘুমিয়ে পড়, শেষ রাত হলে তিনি বললেন-এখন উঠে পড়।" বিষয়টি অবগত হয়ে নবী (সাঃ) বললেন, "সালমান যথার্থ বলেছে।" (সূত্র : বুখারী শরীফ, ইফাবা, দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ৭২৯ অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-২৯৯)।

তাহাজ্জুদের নামায সর্বমোট ১১ রাকআত। এরমধ্যে আট রাকআত নামায দুই রাকআত দুই রাকআত করে আদায় করতে হয় যা 'নামাযে শব' বা 'রাতের নামায' বা 'তাহাজ্জুদ নামায' নামে পরিচিত। তারপরে দুই রাকআত নামায 'নামাযে শাফা' বা 'জোড় রাকআতের নামায' নামে পরিচিত যা ফজরের নামাযের ন্যায় আদায় করা হয়। অপরটি হলো বেজোড় রাকআতের নামায যা এক রাকাত নামায যা 'নামাযে বিতর' নামে পরিচিত।

"রাসূলুল্লাহ তাহাজ্জুদে এগার রাকা'আত নামায আদায় করতেন এবং তা ছিল স্বাভাবিক নামায - - - আর ফজরের (ফরয) নামাযের আগে তিনি দু' রাকা'আত নামায আদায় করতেন।" (বুখারী শরীফ, ইফাবা, দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ১০৫৬ নং হাদীস, পৃষ্ঠা-২৯৯)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথম দু' রাক'আত নামায আদায় করলেন, তারপর দু' রাক'আত, তারপর দু' রাক'আত, তারপর দু' রাক'আত, তারপর দু' রাক'আত, তারপর বিত্র আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুয়ায্জিন তাঁর নিকটে এলেন। তিনি উঠে সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত নামায (ফজরের সুন্নাত) আদায় করলেন। এরপর বের হয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন।" (মুসলিম শরীফ, তৃতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং-১৬৫৯, পৃষ্ঠা-৮৬)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি নামায বাড়িয়ে দিয়েছেন। রক্ত বর্ণের বহু উট থেকেও তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এই নামাযটি হ'ল বিতর। এশার সালাত ও সুবহে সাদিক উভয়ের মধ্যবর্তী সময়টিকে আল্লাহ তা'আলা এর জন্য তোমাদের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" (সূত্র : তিরমিযী শরীফ, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং ৪৫২, পৃষ্ঠা-১৪১)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "বিত্রকে তোমাদের রাতের শেষ

সালাত করবে।" (বুখারী শরীফ, ইফাবা, দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ৯৪৪ নং হাদীস, পৃষ্ঠা-২২৮)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "সুবহে সাদিকের সাথে সাথে রাতের সালাত ও বিতরের ওয়াক্ত চলে যায়। সুতরাং তোমরা সুবহে সাদিকের পূর্বেই বিতর আদায় করে নিবে।" (সূত্র : তিরমিযী শরীফ, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং ৪৬৯, পৃষ্ঠা-১৫৩)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "হে কুরআনের অনুসারীগণ! তোমরা বিতরের নামায আদায় কর। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বেজোড় (একক), কাজেই তিনি বেজোড় (বিতর)-কে ভালবাসেন।" (সূত্র : আবূ দাউদ শরীফ, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং ১৪১৬, পৃষ্ঠা-২৯৬)।

'বিতর' নামাযের মধ্যে মুস্তাহাব হল কুনুত বা দোয়ার মধ্যে ইস্তিগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা করা, সম্ভব হলে চল্লিশজন জীবিত ও মৃত মু'মিনের জন্যে দোয়া করা (সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-২৪৭)। এবং নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। সঠিক রিওয়ায়াতে প্রাপ্ত যে কোন দোয়া কুনুত হিসাবে পড়া যায়।

রমযান মাসের বিশেষ দোয়া :

রমযান মাসে প্রতি রাতে এই দোয়াটি আমল করা। (সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-২৯৩)।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ فِيْهِ الْقُرْاٰنَ وَ افْتَرَضْتَ عَلٰى عِبَادِكَ فِيْهِ اَلصِّيَامَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِيْ حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فِيْ عَامِيْ هٰذَا وَفِيْ كُلِّ عَامٍ وَ اغْفِرْلِيْ تِلْكَ الذُّنُوْبَ الْعِظَامَ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُهَا غَيْرُكَ يَا رَحْمٰنُ يَا عَلَّامُ.

(আল্লাহুমা রব্বা শাহরি রামাদানাল্লাযি আনযালতা ফিহিল কুরআন। ওয়াফ-তারাদ্‌তা আলা ইবাদিকা ফিহিস্‌সিয়াম। সাল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলে মুহাম্মদ, ওয়ারজুক্বনী হাজ্জা বাইতিকাল হারামী ফী আ'মী হাযা ওয়া ফী কুল্লী আম, ওয়াগফির লী তিলকাযজুনূবাল ইযাম, ফা ইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুহা গাইরুক। ইয়া রাহমানু ইয়া আল্লামু।)

অর্থ : "হে আল্লাহ! মাহে রমযানের প্রতিপালক! যে মাসে তুমি কুরআন অবতীর্ণ করেছো এবং স্বীয় বান্দাদের উপর রোযাকে ফরজ করেছো। মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশের উপর শান্তি বর্ষণ কর। এবং তোমার পবিত্র গৃহে আমাকে হজ্জ করার তৌফিক দাও এ বছর এবং প্রতি বছর। আর আমার ঐ বৃহত্তর পাপসমূহকে মাফ করে দাও যা তুমি ছাড়া অন্য কেউ মাফ করতে পারে না। হে দয়ালু, হে সর্বজ্ঞানী।"

রমযান মাসে প্রতি ওয়াজিব নামাযের পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়া :

হযরত সৈয়দ ইবনে তাউস (রহঃ), ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এবং ইমাম মুসা কাযিম (আঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন: "রমযান মাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি ওয়াজিব নামাযের পর এই দোয়া পড়া মুস্তাহাব।" (সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-২৮৯, প্রকাশ-১৩৭৭ ফারসী সন, ১৯৯৮ ইং, হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা (সাঃ আঃ) প্রকাশনী, কোম, ইরান।)

প্রথম দোয়াটি :

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فِي عَامِي هٰذَا وَفِي كُلِّ عَامٍ مَا اَبْقَيْتَنِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ وَسَعَةِ رِزْقٍ وَلَا تَخْلِنِي مِنْ تِلْكَ الْمَوَاقِفِ الْكَرِيمَةِ وَالْمَشَاهِدِ الشَّرِيفَةِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَفِي جَمِيعِ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَكُنْ لِي اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ فِيمَا تَقْضِي وَتُقَدِّرُ مِنَ الْاَمْرِ الْمَحْتُومِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَلَا يُبَدَّلُ اَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمُ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمُ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَاجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَتُقَدِّرُ اَنْ تُطِيلَ عُمْرِي وَ تُوَسِّعَ عَلَيَّ رِزْقِي وَتُؤَدِّيَ عَنِّي اَمَانَتِي وَدَيْنِي اٰمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ .

(আল্লাহুমার জুক্বনী হাজ্জা বাইতিকাল হারামী ফী আ'মী হাজা ওয়া ফী কুল্লি আমীন মা আবক্বইতানী ফী য়ূসরিন মিনকা ওয়া আফিয়াতিন ওয়াসায়াতি রিজক্বিন ওয়ালা তুখলিনী মিন তিলকাল মাওয়াকিফিল কারীমাতি ওয়াল-মাশাহিদিশ শারীফাতি ওয়াজিয়ারাতি ক্বাবরি নাবিয়্যিকা সালওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াফী জামীয়ি হাওয়ায়িজিদ দুন'ইয়া, ওয়াল আখিরাতি, ফা কুল্লী আল্লাহুম্মা ইন্নী আস আলুকা ফী মা তাক্বদী ওয়া তুকাদ্দিরু মিনাল আমরিল মাহতূমি ফী লাইলাতিল ক্বাদরে মিনাল ক্বাদা য়িল্লাজী লা ইয়ু রাদ্দু ওয়া লা ইয়ু বাদ্দালূ আন তাকতুবানী মিন হুজ্জাজি বাইতিকাল হারামিল মাবরূরি হাজ্জুহুমুল মাশকূরি সা'ইয়্যু হুমুল মাগফূরি জুনূবু হুমুল মুকাফফারি আনহুম সাইয়্যিআতুহুম ওয়াজয়াল ফী মা তাক্বদী ওয়া তুকাদ্দিরু আনতুতীলা উমরী ওয়াতুওয়াছি'য়া আলাইয়া রিজক্বী। ওয়া তুয়াদ্দীয়া আন্নী আমানাতী ওয়া দাইনী, আমীনা রব্বাল আলামীন)।

অর্থ : "হে আল্লাহ! তৌফিক দাও তোমার পুতঃপবিত্র গৃহে গমনের (হজ্জ্ব সম্পাদন করার জন্য)। এ বছরই ও প্রতিবছর, যতদিন বেঁচে থাকি। অত্যন্ত সহজভাবে তোমার হতে নিরাপত্তার সাথে এবং জীবিকা নির্বাহের পথ প্রসারিত করার মাধ্যমে। আর আমাকে বঞ্চিত রেখ না ঐসব মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহ (দর্শন করা) থেকে এবং তোমার প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র রওজা মুবারক যিয়ারত করা হতে। অগণিত রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ কর তাঁর (সাঃ) উপর ও তাঁর (সাঃ) বংশের উপর। আর আমার ইহকালীন ও পরকালীন সকল প্রয়োজনের সহায়ক হও। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমার বিনীত আকাঙ্ক্ষা হলো যা কিছু তুমি 'শবে ক্বদর' রজনীতে অবশ্যম্ভাবী আদেশ (রায়) দ্বারা পূর্ণ ও নির্ধারণ কর, যে রায়ের কোন প্রত্যাবর্তন বা পরিবর্তন নাই। (তাই এ পবিত্র মাসে) রজনীগুলিতে তুমি আমার নামটি ক্বাবা গৃহের হাজীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে নাও। যাদের হজ্জ সঠিক। যাদের সা'য়ী (প্রদক্ষিণ) পুরোপুরি মূল্যায়িত। যাদের পাপসমূহ মোচিত। যাদের মন্দ আচরণসমূহ কাফফারাহ হিসেবে গন্য এবং তোমার নির্ধারিত ভাগ্যলিপিকে নির্ধারণ কর আমার দীর্ঘায়ু বৃদ্ধিতে। এবং রুজি-রোযগারের (জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে) প্রসারণ ঘটাও এবং আমার নিকট গচ্ছিত আমানত ও ঋণের বোঝা হালকা (পরিশোধ) করে দাও। আমীন। কবুল কর হে জগতসমূহের প্রতিপালক।"

দ্বিতীয় দোয়া :

দ্বিতীয় এই দোয়াটি রমযান মাসের প্রতি ওয়াজিব নামাযের পর পড়া হয়। (সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-২৮৯) ঃ

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ اَنْتَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهٰذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَ شَرَّفْتَهُ وَ فَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيَّ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ اَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْاٰنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ وَ جَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا خَيْرًا مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ فَيَاذَا الْمَنِّ وَ لَا يُمَنُّ عَلَيْكَ مُنَّ عَلَيَّ بِفَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فِيمَنْ تَمُنُّ عَلَيْهِ وَ اَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

(ইয়া আলীয়্যু, ইয়া আযীমু, ইয়া গফূরু, ইয়া রাহীমু, আনতার রাব্বুল আযীম। আল্লাযী লাইসা কামিছলীহি শাইয়ুন ওয়া হুওয়াস ছামীউল বাসীর। ওয়া হাযা শাহরুন আয্যামতাহু ওয়া কাররামতাহু, ওয়া শাররাফতাহু ওয়া ফাদদালতাহু আলাশ শুহূরে। ওয়া হুয়াশ-শাহরুল-লাযী ফারাদতা সিয়ামাহু আলাইয়া। ওয়া হুয়া শাহরু রমাদানা-ল্লাযী আনযালতা ফীহিল কুরআনা হুদাল্লীননাসি ওয়া বাইয়্যেনাতিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরক্বানু ওয়া জায়ালতা ফীহি লাইলাতাল ক্বাদ্‌রি। ওয়া জায়ালতা খাইরুমমিন আলফি-শাহরিন ফাইয়া জালমান্নি ওয়া লা ইয়্যুমান্নু আলাইকা। মুন্না আলাইয়া বি-ফিকাকি রাক্বাবাতী মিনাননার। ফীমান তামুন্নু আলাইহি। ওয়া আদখিলনীল জান্নাতা বি-রহমাতিকা ইয়া আর হামার রহিমীন।)

অর্থ : "হে মহান, হে বৃহৎ, হে ক্ষমাকারী, হে দয়ালু! তুমি মহান বৃহত্তর প্রতিপালক যার সমকক্ষ কিছু নেই এবং যিনি শ্রবনকারী ও দর্শনকারী। তুমি এ মাসকে শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব এবং আভিজাত্য দান করেছো এবং অন্য মাসের উপর এ মাসকে প্রাধান্য দিয়েছো এবং এটা এমন মাস যাতে আমার উপর রোযা রাখাকে ফরজ করেছো এবং এটা রমযান মাস যাতে পবিত্র কুরআনকে নাযিল

করেছো, যা মানুষের হেদায়েতের জন্য, যা হেদায়েতের জন্য নির্ভুল (গ্রন্থ) এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। তুমি এ মাসের পবিত্র রজনীতে 'লাইলাতুল ক্বদর'-কে নির্ধারণ করেছো এবং একে হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছো। হে অনুগ্রহকারী! আমার উপর অনুগ্রহ করো। দোযখের আগুন থেকে আমার শরীরকে রক্ষা করো, তাদের মত যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছো। এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও নিজ রহমত দ্বারা, হে পরম দয়ালু।"

নামায শেষে প্রার্থনা বা মোনাজাতের সময় এ (নিম্নোক্ত) দোয়াটি পড়া হয়। তবে বৎসরের অন্যান্য সময়ও এ দোয়াটি পড়া যায়। হযরত শেখ কাফয়ামি (রহঃ) তার 'বালাদুল আমীন' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা হলো- "যে ব্যক্তি এ দোয়াটি রোযার মাসে প্রতি ওয়াজিব নামাযের পর পাঠ করবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন তার সকল গোনাহ মাফ করে দিবেন।" (সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-২৯০)। দোয়াটি হচ্ছে :

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ السُّرُوْرَ اَللّٰهُمَّ اَغْنِ كُلَّ فَقِيْرٍ اَللّٰهُمَّ اَشْبِعْ كُلَّ جَائِعٍ اَللّٰهُمَّ اكْسُ كُلَّ عُرْيَانٍ اَللّٰهُمَّ اقْضِ دَيْنَ كُلِّ مَدِيْنٍ اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ عَنْ كُلِّ مَكْرُوْبٍ اَللّٰهُمَّ رُدَّ كُلَّ غَرِيْبٍ اَللّٰهُمَّ فُكَّ كُلَّ اَسِيْرٍ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فَاسِدٍ مِنْ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ كُلَّ مَرِيْضٍ اَللّٰهُمَّ سُدَّ فَقْرَنَا بِغِنَاكَ اَللّٰهُمَّ غَيِّرْ سُوْءَ حَالِنَا بِحُسْنِ حَالِكَ اَللّٰهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَ اَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

(আল্লাহুম্মা আদখিল আলা আহলিল কুবূরিস সুরূর, আল্লাহুম্মা আগনি কুল্লা ফাক্বীর, আল্লাহুম্মা আশবি'য় কুল্লা জাইয়িয়িন, আল্লাহুম্মাক-সু কুল্লা উরইয়ান, আল্লাহুম্মাক্ব-দ্বি দাইনা কুল্লি মাদীন, আল্লাহুম্মা ফাররিজ আনকুল্লি মাকরূব, আল্লাহুম্মা রুদ্দা কুল্লা গারীব। আল্লাহুম্মা ফুক্কা কুল্লা আসীর, আল্লাহুম্মা আসলীহ কুল্লা ফাসীদিম মিন উমূরিল মুসলিমীন, আল্লাহুম্মাশফী কুল্লা মারীদ্ব, আল্লাহুম্মা সুদ্দা ফাক্বরানা বি গীনাক, আল্লাহুম্মা গাইয়ির সূআ-হালিনা বিহুসনি হালিক, আল্লাহুম্মাক্বদ্বি আন্নাদ দাইনা ওয়া আগনিনা মিনাল ফাকরি ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।)

অর্থ : "হে আল্লাহ! তুমি কবরবাসীদের প্রতি প্রফুল্লতা দান কর। হে আল্লাহ! প্রত্যেক দরিদ্রকে অভাবমুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ! প্রত্যেক ক্ষুধার্তকে ক্ষুধা নিবারন করে দাও। হে আল্লাহ! প্রত্যেক বস্ত্রহীনের বস্ত্রের ব্যবস্থা কর। হে আল্লাহ! প্রত্যেক ঋণগ্রস্থের ঋণ পরিশোধ করে দাও। হে আল্লাহ! দুঃখ দূর্দশায় নিপতিতদের দুঃখ দূর্দশা নিবারণ করে দাও। হে আল্লাহ প্রবাসে অসহায়দেরকে স্বদেশে ফেরৎ পাঠাও। হে আল্লাহ! প্রত্যেক বন্দীদের মুক্তি দাও। হে আল্লাহ! মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত ফ্যাসাদকারীদের (ঝগড়া, বিবাদ, অনৈক্য, ধবংসাত্বক) কর্মকান্ডকে সংশোধন কর। হে আল্লাহ! প্রত্যেক রোগগ্রস্থকে আরোগ্য দান কর। হে আল্লাহ! তোমার পবিত্র অমুখাপেক্ষী সত্তার মাধ্যমে আমাদের অভাবকে দূর কর। হে আল্লাহ! আমাদের মন্দ অবস্থাকে তোমার উত্তম অবস্থা দ্বারা পরিবর্তন করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের ঋণের বোঝাকে হালকা (আদায়) করে দাও এবং আমাদের নিঃস্ব অবস্থাকে সামর্থবান করে দাও। কেননা তুমিই সমস্ত কিছুর উপর পরাক্রমশালী।"

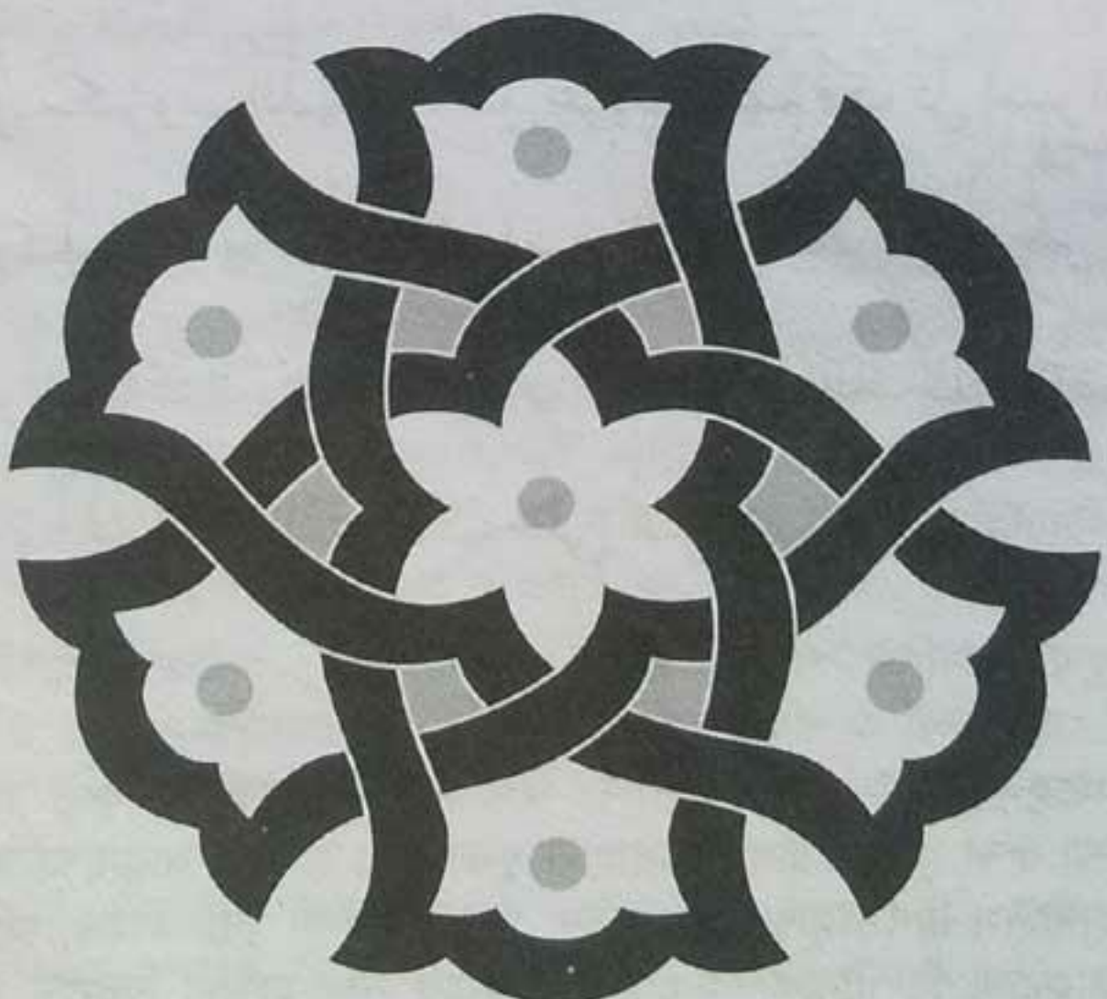

ক্বদরের রাত :

শবে ক্বদর হচ্ছে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করার রাত। শবে ক্বদরের প্রতিটি মুহূর্ত নূর দ্বারা প্রজ্জ্বলিত। প্রত্যেক মু'মিন নর-নারীর উচিত ক্বদরের রাত জেগে ইবাদত বন্দেগী ও আত্মশুদ্ধিতে মগ্ন থাকা। মহান আল্লাহর বিশেষ ও নির্দিষ্ট একটি সূরা (সূরা আল-ক্বাদর) অবতীর্ণ করার মাধ্যমে 'শবে ক্বদর'-কে আমাদের মাঝে পরিচয় করিয়েছেন। সূরা আল-ক্বাদরে বলা হয়েছে, "আমরা তা (আল-কুরআন) ক্বদরের রাত্রিতে নাযিল করেছি। তুমি কি জান ক্বদরের রাত্রি কি? ক্বদরের রাত্রি হাজার মাস থেকেও অধিক উত্তম। ফেরেশ্‌তা ও রূহ এই (রাত্রিতে) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সব হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়। সে রাত্রি পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তা- ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।"

শবে ক্বদর এর অর্থ মহিমান্বিত (গৌরবমন্ডিত) রাত। 'শব' ফার্সী শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে রাত। ফার্সী ও আরবীতে 'ক্বদর' শব্দের অর্থ সম্মান, মর্যাদা, মহিমা, ভাগ্য নির্ধারণ প্রভৃতি। আরবীতে রাতকে বলা হয় 'লাইলাতুন'। এ হিসেবে 'শবে ক্বদর' বা 'লাইলাতুল ক্বদর' মানে মহিমান্বিত রজনী। 'ক্বদর' এর এক অর্থ মাহাত্ম ও সম্মান। এই মাহাত্ম ও সম্মানের কারণে একে 'লাইলাতুর ক্বদর' তথা 'মহিমান্বিত রাত' বলা হয়। 'ক্বদর' এর আরেক অর্থ 'তাক্বদীর' এবং আদেশও হয়ে থাকে। 'লাইলাতুল বারাত' (ভাগ্য রজনী), 'লাইলাতুল ক্বদ্‌র' (মহিমান্বিত রজনী) এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে হলে এবং এ থেকে সুফল পেতে হলে আমাদেরকে নিম্নের তিনটি শব্দ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা দরকার। এক- ক্বাদর বা তাক্বদির, দুই- ক্বাজা বা চুড়ান্ত ভাবে মীমাংসা বা ফয়সালা। তিন-বাদা (পরিবর্তন)। কারণ, এই তিনটি শব্দের মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে পবিত্র আল-কুরআনের নিম্নের দু'টি আয়াতের ব্যাখ্যা। "সে ভাল যা উপার্জন করে, তা তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে, তাও তারই।' (সূরা বাকারা-২৮৬)। "আর মানুষ তাই পায় যা সে করে।" (সূরা নাজ্‌ম-৩৯)। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তা আলোচিত হলো :

ক্বাদর : 'ক্বাদর' বা 'তাক্বদির' শব্দটি অর্থ হল 'পরিমাপ' বা 'অনুপাত' বা যাকে আমরা 'তাক্বদির' বলি। 'তাক্বদির' শব্দটি 'ক্বাদরুন' শব্দমূল থেকে উদ্ভুত। 'ক্বাদরুন' এর অর্থ হলো পরিমাণ নির্ধারণ, যথাযথ হওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা কর্তৃক পরিমাপণ অর্থ হল; 'মহান আল্লাহ সকল কিছুর জন্যেই সংখ্যাগত ও গুণগত স্থান, কাল ও পাত্রগত পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, যা পর্যায়ক্রমে বিভিণ্ন কারণ ও নির্বাহকের প্রভাবে বাস্তব রূপ লাভ করে থাকে। 'তাক্বদির' শব্দটির অর্থ হল 'পরিমাণ' বা 'অনুপাত'। কোন কিছুকে নির্দিষ্ট পরিমাপে তৈরী করা। ক্বাদর বা তাক্বদির দ্বারা সৃষ্টি-ব্যবস্থার

প্রকৃতি ও গুণকে এবং সুশৃঙ্খল বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি সৃষ্টিই তার সৃষ্টির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত বিকাশ লাভের যে স্তরগুলো অতিক্রম করে, সেগুলোর মধ্যে অবশ্যই একটি গভীর ও সুশৃঙ্খল সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। যার ফলে বিকাশ লাভের প্রতিটি স্তর অতিক্রমের পর তা তার পরবর্তী স্তরের দিকে অগ্রগামী হয়ে পূর্ণাঙ্গরূপই লাভ করে। আর এ নীতির বৈপরীত্য সৃষ্টি জগতের বা প্রকৃতির কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা এ সৃষ্টিলোককে সুপরিকল্পিত ও সুশৃংখল কাঠামো প্রদান করেছেন। সকল সৃষ্টির সাথে আল্লাহর সৃজনশীলতার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যেমন পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে- "তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে।" (সূরা ফুরকান, ২নং আয়াত)। অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য যাবতীয় বিষয় পরিমিত ও নির্ধারণ করা। এর ব্যাখা হলো, সৃষ্টি জগতের জন্য আল্লাহর নির্ধারণ। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের মধ্যে কার কি আকৃতি-প্রকৃতি, কর্ম, দায়িত্ব, গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য হবে কার জন্ম-মৃত্যু কোথায় এবং কখন কিভাবে হবে ইত্যাদি বিষয় স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এর মধ্যে সৃষ্টির কোন ইখতিয়ার নেই। আল্লাহর এই নির্ধারণকে 'তাক্বদীর' বলে।

তবে ক্বাদর বা তাক্বদির হচ্ছে বাহ্যিক ও বাস্তবভাবে কোন কিছুর সীমা ও অনুপাত নির্দিষ্ট করে দেয়া, তা মানসিকভাবে বা চুড়ান্তভাবে নয়। তাক্বদিরের স্তর হল কাযার পুর্বে, যার কয়েকটি পর্যায় বিদ্যমান। এ 'তাক্বদির' নিকটবর্তী সূচনা, মধ্যবর্তী সূচনা, দূরবর্তী সূচনা এর সমন্বয়ে রূপ পরিগ্রহ করে এবং কোন শর্ত বা কারণের পরিবর্তনে পরিবর্তিত রূপ লাভ করে। একটি ভাগ্যলিপির (ক্বাদর) দ্বারা আরেকটি ভাগ্যলিপি পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ক্বাজা : 'ক্বাজা' শব্দটি 'চুড়ান্তভাবে সম্পন্নকরণ বা কর্ম সম্পাদন বা মীমাংসা বা ফয়সালা' ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ক্বাজা' বা 'ফয়সালা' মানে হচ্ছে কোন কিছু নির্ধারিত হয়ে যাওয়া যার পরিবর্তন সম্ভব নয়। আল্লাহ কর্তৃক 'চুড়ান্তভাবে সম্পন্নকরণ বা কর্ম সম্পাদন বা মীমাংসা' এর অর্থ হল এ যে, কোন ঘটনার ক্ষেত্রে কারণ ও ভূমিকাসমূহের উপযুক্ত যোগানের পর, মহান আল্লাহ ঐ ঘটনাকে নিশ্চিত ও চুড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করেন। এ বিষয়টি দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার সৃজনশীলতা ও তাঁর কাজকে বুঝায়। 'ক্বাদর' হলো বিভিন্ন স্তর বা দশাগুলোর সমন্বিত রূপ। আর 'ক্বাজা' হলো একদশা বিশিষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার শর্ত ও কারণের উপস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত যা সুনিশ্চিত ও অলংঘনীয়। এ সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কোন কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন তখন উহার জন্য শুধু বলেন, 'হও', আর উহা হইয়া যায়।" (সূরা বাকারা, ১১৭নং আয়াত), "আল্লাহ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং ইহা হইয়া যায়।" (সূরা আল-ইমরান, ৪৭ নং আয়াত)।

"তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।" (সূরা মারইয়াম, ৩৫নং আয়াত), "তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি উহার জন্য বলেন, 'হও', আর উহা হইয়া যায়।" (সূরা মু'মিন বা গাফির, ৬৮নং আয়াত)।

বাদা (পরিবর্তন) : অনিশ্চিত ও শর্তাধীন 'তাক্বদীর' সমূহকে রিওয়ায়াতের ভাষায় 'বাদা' নামকরণ করা হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে বাদা হলো, কোন ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া বা পরিবর্তন করা, যা পূর্বে ছিল না। অর্থাৎ পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নতুন সিদ্ধান্ত নেয়া। এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ হলো এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা যা তার জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কাজ করে। মানুষের ভাগ্য নিয়ামক উপাদানসমূহ বা তার কোন একটি পরিবর্তিত হয়ে গেলে তার ভাগ্যও পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থাৎ দৃশ্যতঃ যা চিরন্তন অথবা অলংঘনীয় বলে মনে হয় মানুষের কাজ-কর্মে ও আচরণে পরিবর্তন ঘটায়, যার ফলে তাতে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বিভিন্ন বস্তুগত উপাদান যেভাবে মানুষের ভাগ্যকে পরিবর্তিত করে দেয়, ঠিক সেভাবেই অবস্তুগত উপাদানসমূহ নতুন ভাগ্যরূপে প্রকাশ করতে পারে। যেমন- কেউ যদি কোন মন্দ কাজ করে ফেলে পরমুহূর্তে বিষয়টি তার চিন্তায় আসার কারণে সে অনুশোচনা করে, তওবা করে এবং মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তার জন্য কোনটি কল্যাণকর তা মন্দ কাজ করার সময় না জানার জন্য বা তার অজ্ঞতার ফলেই এমনটি ঘটে। অর্থাৎ এটি হলো ব্যক্তির অজ্ঞতা ও ঘাটতির ফল। তবে এরূপ অজ্ঞতার অর্থে 'বাদা' মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব। এটা আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পূর্বের অজ্ঞতা, কোন বাস্তবতা প্রকাশিত হবার পর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন, এরূপ ধারণা আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞানের বিশ্বজনীনতার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং কোন মুসলমানই এরূপ ধারণা করতে পারে না। পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তার কাছেই রয়েছে।" (সূরা রা'দ-৩৯)। আর এর অর্থ হলো- মহান আল্লাহ কখনো কখনো কোন কল্যাণময়ী কারণবশতঃ তাঁর নবী-রাসূল ও ওয়ালীদের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে কোন কিছুর প্রকাশ ঘটান। অতঃপর তা অপনোদন করেন এবং প্রথমোক্ত ক্ষেত্রের পরিবর্তে অন্য কিছু ঘটান যদিও এ সম্পর্কে তাঁর পূর্বেই জ্ঞান রয়েছে। যেমন- বাদার এ অর্থটি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর শরীয়তের পূর্বেকার শরীয়তসমূহের রহিতকরণের (নাসখ) অর্থ প্রকাশ করে, এমনকি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর কিছু শরীয়তকে রহিত (মানসুখ) করার কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করে। ক্বদরের রাতে ভাগ্য পরিবর্তন মানে 'ক্বাদর বা তাক্বদির' পরিবর্তন এবং 'বাদা' সংঘটিত হওয়া। ক্বাজা বা 'চুড়ান্তভাবে মীমাংসা' বা

'ফয়সালা' এর পরিবর্তন নয়। নিম্নে শবে ক্বাদর সম্পর্কে কিছু হাদীস বর্ণিত হলো :

আমীরুল মু'মিনিন হয়রত ইমাম আলী (আঃ) এক ব্যক্তি কর্তৃক ক্বাজা ও ক্বাদর সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে ক্বাজা ও ক্বদরের স্তর সম্পর্কে বলেন: "ক্বাজা ও ক্বদর বলতে বুঝায় আনুগত্যের আদেশ ও পাপাচারের নিষেধ। আর সেই সাথে মানুষকে ভাল কর্ম সম্পাদন ও অপছন্দনীয় কর্ম থেকে দূরে থাকার ক্ষমতা প্রদান, আল্লাহর নৈকট্যলাভের তৌফিক প্রদান, পাপিষ্ঠদেরকে তাদের উপর ছেড়ে দেয়া এবং প্রতিশ্রুতি প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন। এগুলো হলো আমাদের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্বাজা ও ক্বদর।" [সূত্র : শেইখ সাদুক (মৃত্যু-৩৮১হিঃ), আত-তাওহীদ, পৃষ্ঠা-৩৮০]।

অষ্টম ইমাম হযরত আলী রেজা (আঃ) ক্বদর ও ক্বাজা এর ব্যাখ্যায় বলেন, "ক্বদর হলো 'বাক্বা' (স্থিতি) ও 'ফানার' (বিনাশ) দৃষ্টিকোণ থেকে পরিমাপকরণ। আর ক্বাজা হলো, বাস্তব নিশ্চিত ও চূড়ান্ত বাস্তবায়ন।" [সূত্র : আল-কুলাইনী (মৃত্যু- ৩২৯হিঃ), আল-কাফী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫৮]।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসের সিয়াম পালন করবে এবং রাত্রি জাগরণ করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় লায়লাতুল ক্বাদরের রাত্রি জাগরণ করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।" (সূত্র : তিরমিযী শরীফ, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং-৬৮০, পৃষ্ঠা-৫৮)।

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রমযান মাস এলো, তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তোমাদের কাছে এ মাস এসেছে। আর এতে রয়েছে এমন এক রাত্র, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। এ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি তো সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। এর কল্যাণ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত, সে প্রকৃত পক্ষেই বঞ্চিত।" (সূত্র : সুনানু ইবনে মাজাহ্, ইফাবা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-১৬৪৪, পৃষ্ঠা-৮৪)।

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেছেন, "আমল (নেক কাজ) হিসাবের দিক থেকে বছরের শুরু হচ্ছে শবে ক্বদর। এ রাত্রে আগামী বছরের কর্মসূচী লেখা হয়ে থাকে।" [সূত্র : আল-আমিলী (মৃত্যু- ১১০৪হিঃ), ওয়াসায়েলুশ শিয়া, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৫৮, হাদীস নং-৮]।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদরের সন্ধান কর।" (সূত্র : বুখারী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, হাদীস নং-১৮৯০, পৃষ্ঠা-২৯৫)। মা'সুমিন (আঃ) কর্তৃক শবে ক্বদর সম্পর্কে যে সকল ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তাতেও কোন রজনীকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।

যুরারাহ ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, "১৯ তারিখের রাত (১৮ তারিখ দিবাগত রাত্রে) শবে তাকদির তথা ভাগ্য নির্ধারণের রাত্র, ২১শে রজনী নির্দিষ্ট করার রাত্র এবং ২৩শে রজনী শেষ ও সিল করার রজনী।" [সূত্র : আল-আমিলী (মৃত্যু-১১০৪হিঃ), ওয়াসায়েলুশ শিয়া, খন্ড-৭, অধ্যায়-৩২, হাদীস-১ ও ২; আত-তাহযীব, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩০]।

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেছেন, "কর্মসমূহের হিসাব-নিকাশ উনিশের রাতে সম্পূর্ন হয়ে থাকে ও একুশের রাতে চুড়ান্ত হয় এবং তেইশের রাতে কার্যকর করা হয়ে থাকে।" (সূত্র : ওয়াসায়েলুশ শিয়া, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৫৯)।

ফাযিল ইবনে ইয়াসার বলেন, "ইমাম বাকির (আঃ) রমযান মাসের একুশ ও তেইশের রাতে সারারাত দোয়া পড়ায় মশগুল থাকতেন আর যখন রাত শেষ প্রান্তে পৌছাতো তখন ফজরের নামায আদায় করতেন।" (সূত্র : ওয়াসায়েলুশ শিয়া, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৬০, হাদীস-৪)।

আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে আরজ করিলেন: "আমি এমন এক ব্যক্তি যাহার বাড়ি অনেক দূরে অবস্থিত, তাই আমাকে আপনি একটি রাত্র বলিয়া দিন যে রাত্রে আমি (ইবাদতের জন্য এই মসজিদে) আগমন করিব।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহাকে বলিলেন: "তুমি রমযানের তেইশে রাত্রে আগমন কর।" [সূত্র : মুয়াত্তা, ইমাম মালিক (রঃ), ইফাবা, প্রথম খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ই'তিকাফ অধ্যায়, হাদীস নং-১২, পৃষ্ঠা-৩৯৬; আবূ দাউদ শরীফ, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং-১৩৮০, পৃষ্ঠা-২৭৭]।

শেইখ সাদুক বলেন: "আমাদের সকল রাবীগণ এ বিষয়ের উপর ঐক্যমত্য পোষণ করে বলেছেন যে, শবে ক্বদর হল রমযান মাসের ২৩ তারিখের রাত্রে।" [শেইখ সাদুক, (মৃত্যু-৩৮১হি:) আল-খিসাল, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১০২;]।

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় :

'জাফরী ফিকাহ'র ফকীহ্দের মতে, মহানবী (সাঃ) ২৭শে রজব নবুওয়াতে অভিষিক্ত হন বা এদিন তাঁর বে'সাত দিবস। কিন্তু সুন্নী মতালম্বী ফকীহ্দের মতে, তিনি পবিত্র রমযান মাসে এ সুমহান মর্যাদা লাভ করেন। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মহানবী (সাঃ) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির দিবস নির্ধারণ করার ব্যাপারে প্রচলিত অভিমত হচ্ছে, যেহেতু নবুওয়াত দিবস ওহীর সূচনা এবং পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার দিবস ছিল। অতএব অবশ্যই বলা উচিত যে, নবুওয়াত দিবস যে মাসে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল সে মাসেই হতে হবে। আর ঐ মাসটি হচ্ছে পবিত্র রমযান। যা নিম্নো লিখিত আয়াত থেকে জানা যায়।

"রমযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের নিদর্শন ও

সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।" (সূরা বাকারা-১৮৫)।

"শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের (আল-কুরআন)। আমি তো ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক মুবারক রজনী (ক্বদর রাত্রে)-তে।" (সূরা দুখান-২ ও ৩)।

"নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনী (লাইলাতুল ক্বদ্‌র)-তে ।" (সূরা কাদর-১)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআন মাহে রমযানের (রমযান মাসের) কোন একটি বরকতময় রাত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর উক্ত রজনী পবিত্র আল-কুরআন এ 'শবে ক্বদর' অর্থাৎ ভাগ্য রজনী নামে পরিচিত হয়েছে। আর এসব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় না যে, ঐ রাত্রেই পবিত্র আল-কুরআন মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র হৃদয়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। বরং পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ধরনের অবতরণ (নুযুল) থাকার সম্ভাবনাই বেশী। এসব অবতরণের (নুযুলের) অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে মহানবী (সাঃ) এর ওপর পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক অবতরণ (নুযুল)।

আরেক ধরনের অবতরণ (নুযুল) হচ্ছে একত্রে একবারে সম্পূর্ণ কুরআনের নুযূল। এ বক্তব্য ও অভিমতের পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, সূরা দুখানের ৩নং আয়াতটি। এর স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে যে, "আমি একে (সম্পূর্ণ কুরআনটি) নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে।" অবশ্যই এ অবতরণটি (নুযুল) ঐ (সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত) নুযুল থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, যা (সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত) মহানবী (সাঃ) এর নবুওয়াতের অভিষেকের দিবস (বে'সাত দিবস) এ বাস্তবায়িত হয়েছিল। কারণ, নবুওয়াতের অভিষেকের দিবসে গুটিকতক আয়াতই (সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত) অবতীর্ণ হয়েছিল।

পবিত্র কুরআনের যেমন একটি সার্বিক ও তাত্ত্বিক এবং প্রকৃত বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তা হলো, আল-কুরআন একযোগে একত্রে (একবারেই) পবিত্র রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল। তেমনি এ গ্রন্থের আরেকটি অস্তিত্ব আছে, যা পর্যায়ক্রমিক বা ধারাবাহিক ছিল। যার সূচনা মহানবী (সাঃ) এর নবুওয়াতের অভিষেক দিবসে কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মহানবী (সাঃ) এর জীবনসায়াহ্ন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক অবতরণ মহানবী (সাঃ) এর নবুওয়াতের অভিষেক দিবসে শুরু হয়ে তাঁর ওফাত পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

সুতরাং ২৭শে রজব যদি মহানবী (সাঃ) এর ওপর সূরা আলাকের কয়েকটি আয়াত এবং রমযান মাসে যদি (পবিত্র কুরআনের ভাষায়) 'লওহে মাহফূয' বা 'সংরক্ষিত ফলক' নামক একটি স্থান থেকে অন্য একটি স্থান যা রিওয়ায়াতসমূহে 'বাইতুল মামুর' নামে অভিহিত হয়েছে সেখানে একত্রে একবারে সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ (নাযিল) হয়, তাহলে এতে কোন অসুবিধা ও আপত্তি থাকতে পারে না।

'জাফরী ফিকাহ'র ফকীহ্ ও অন্যান্য মাযহাবের কিছু ফকীহ্দের থেকে এ প্রসঙ্গে বেশকিছু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল আযীম আযযারকানী 'মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমুল কুরআন' নামক গ্রন্থের ১ম খন্ডে ঐ সব রিওয়ায়াত বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা তাবাতাবাঈ তার তাফসীর আল-মীযান এর ২য় খন্ডের ১৪-১৬ পৃষ্ঠায় বলেন, "সম্পূর্ণ কুরআনের প্রকৃত স্বরূপ ও হাকীকত রমযান মাসে মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র অন্তঃকরণের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ যার (আল-কুরআন) সাথে মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূলকে রমযান মাসের কোন একটি নির্দিষ্ট রজনীতে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু মহানবী (সাঃ) সম্পূর্ণ পবিত্র আল-কুরআন সম্পর্কে অবগত ছিলেন তাই যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক অবতীর্ণের (নুযূলের) বিধান বাস্তবে জারী করা না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে ত্বরা (দ্রুততা, ব্যগ্রতা, তাড়া, তাগাদা) না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কুরআনের এই আয়াতের মাধ্যমে। আয়াতটি হলো- "তোমার প্রতি ওহী (অবতীর্ণ) করার আগেই কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না।" (সূরা ত্বা-হা-১১৪)।

২৭শে রজব মহানবী (সাঃ) নবুওয়াতে অভিষিক্ত হন (বে'সাত দিবস)। আর এর পরেও আরো বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তিনি স্বর্গীয় আহ্বান শুনতে পেতেন। তিনি শুনতে পেতেন যে, তিনি মহান আল্লাহর রাসূল। কিন্তু তখনও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের কোন অনুমতি দেয়া হয়নি। এ অবস্থায় দীর্ঘ তিন বছর স্থায়ী ছিল। অর্থাৎ "ইক্বরা বিছ্মি রাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব - - - -।" সূরা আলাক এর প্রথম পাঁচটি আয়াত অবর্তীণ হওয়ার তিন বছর পর্যন্ত কুরআনের কোন আয়াত অবর্তীণ হয়নি। এ তিন বছরকে 'ফাতরাতুল অহী' বা অহী বন্ধ হওয়ার বছর বলা হয়। মহানবী (সাঃ) এর বে'সাতের (নবুওয়াতের অভিষেকের) পর দীর্ঘ তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। এ তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পরপরই পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হতে থাকে। সূরা হিজর-৯৪ নং এ আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূল (সাঃ) প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের অনুমতি পান। আয়াতটি হচ্ছে- "যা কিছুর প্রতি তুমি নির্দেশিত হয়েছো তা প্রকাশ কর।" [সূত্র : চিরভাস্বর মহানবী (সাঃ), আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী, বাংলা অনুবাদ, ১ম খন্ড, ২১০-২১৪ পৃষ্ঠা। কালচারাল কাউন্সেলর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা এর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত।]

শবে ক্বদরের আমলসমূহ :

শবে ক্বদরের আমল দু'ধরনেরঃ একটি হচ্ছে তিন (১৯, ২১, ২৩শে রমযান) রাত্রেই করতে হবে এবং অপরটি হচ্ছে প্রতি রাত্রের বিশেষ আমল। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো। যে আমলসমূহ তিন রাতেই করতে হবে তা হচ্ছে :

(১) শবে ক্বদরের রাত্রে গোসল করা মুস্তাহাব।

(২) দুই রাকাত নামায, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা (হামদ) এর পর ৭ বার সূরা ইখ্লাস (কুল হুয়াল্লাহু) পড়তে হবে এবং নামায শেষে ৭০ বার "আসতাগ-ফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি।" পড়তে হবে।

(৩) পবিত্র আল-কুরআন মজিদ খুলে সামনে রেখে বলতে হবে :

[সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩৭১ এবং হযরত সৈয়দ ইবনে তাউস (রহঃ), ইক্বালুল আমল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৬]।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَمَا فِيْهِ وَفِيْهِ اسْمُكَ الْاَكْبَرُ
وَاَسْمَآؤُكَ الْحُسْنٰى وَمَا يُخَافُ وَيُرْجٰى اَنْ تَجْعَلَنِیْ مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ.

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বি কিতাবিকাল মুনযালি। ওয়া মা ফীহি ওয়া ফীহিস্মুকাল আকবার। ওয়া আসমাউকাল হুসনা। ওয়ামা ইউখাফু ওয়া ইউরজা। আন তাজয়ালানী মিন উতাক্বায়িকা মিনান নার।)

অর্থ : "হে আল্লাহ আমি তোমার নাযিলকৃত কিতাব (কুরআন মজিদ) দ্বারা শপথ করছি এবং যাকিছু উহাতে রহিয়াছে। এবং তোমার বৃহত্তর নাম যাহা উহাতে রহিয়াছে (তাহার শপথ) এবং তোমার ঐ সকল নামসমূহ যা অতিসুন্দর এবং যাতে ভয় ও আশা রয়েছে। আমাকে দোযখবাসীদের থেকে পরিত্রাণকারীদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত কর।"

(৪) তারপর পবিত্র আল-কুরআন মজিদ মাথায় রেখে বলতে হবে:

[সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩৭২ এবং হযরত সৈয়দ ইবনে তাউস (রহঃ), ইক্বালুল আমল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৬]।

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ هٰذَا الْقُرْاٰنِ وَبِحَقِّ مَنْ اَرْسَلْتَهٗ بِهٖ وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهٗ فِيْهِ وَبِحَقِّكَ
عَلَيْهِمْ فَلَا اَحَدَ اَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ.

(আল্লাহুমা বিহাক্কি হাযাল কুরআন। ওয়া বিহাক্কি মান আরসালতাহু বিহি, ওয়া

বিহাক্কি কুল্লি মু'মিনিন মাদাহ্তাহু ফীহি। ওয়া বিহাক্কিকা আলাইহীম ফালা আহাদা আ'রাফু বিহাক্কিকা মিনকা।)

অর্থঃ "হে আল্লাহ! এই কুরআনের হকের শপথ এবং প্রেরনকৃত [রাসূল (সাঃ)] এর হকের শপথ এবং প্রত্যেক মু'মিনের হকের শপথ যাহাদের প্রশংসা উহাতে করিয়াছ। এবং হে আল্লাহ! তোমার হকের শপথ তাহাদের উপর, যাহা তুমি ব্যতিত আর কেহ বেশী জানে না। স্বয়ং তোমার হকের শপথ যাহা আমি তোমাকে দিচ্ছি।"

(৫) অতঃপর কুরআন মজিদ মাথায় রাখা অবস্থায় নিম্নের প্রতিটি নাম ১০ (দশ) বার করে বলতে হবে : [সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩৭১-৩৭২; হযরত সৈয়দ ইবনে তাউস (রহঃ), ইক্বালুল আমল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৬]।

بِكَ يَا اَللّٰهُ بِمُحَمَّدٍ بِعَلِيٍّ بِفَاطِمَةَ بِالْحَسَنِ بِالْحُسَيْنِ بِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ
بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ بِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى
بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْحُجَّةِ

(১) বিকা ইয়া আল্লাহু (২) বি মুহাম্মাদিন (৩) বি আলীইন (৪) বি ফাতিমাতা (৫) বিল হাসানি (৬) বিল হুসাইনি (৭) বি আলী ইবনিল হুসাইন (৮) বি মুহাম্মাদ ইবনে আলীইন (৯) বি জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদিন (১০) বি মূসা ইবনে জা'ফারিন (১১) বি আলী ইবনে মূসা (১২) বি মুহাম্মাদ ইবনে আলীইন (১৩) বি আলী ইবনে মুহাম্মাদিন (১৪) বিল হাসান ইবনে আলীইন (১৫) বিল হুজ্জাতি।

অর্থ : (১) হে আল্লাহ তোমার শপথ (২) মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শপথ (৩) ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-এর শপথ (৪) হযরত ফাতিমা যাহ্রা (সাঃ আঃ)-এর শপথ (৫) ইমাম হাসান ইবনে আলী (আঃ)-এর শপথ (৬) ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (আঃ)-এর শপথ (৭) ইমাম আলী ইবনে হুসাইন (যয়নুল আবেদীন) (আঃ)-এর শপথ (৮) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী (বাকির) (আঃ)-এর শপথ (৯) ইমাম জা'ফর ইব্নে মুহাম্মাদ (জা'ফর সাদিক) (আঃ)-এর শপথ (১০) ইমাম মূসা ইব্নের জাফর (আল-কাজিম) (আঃ)-এর শপথ (১১) ইমাম আলী ইব্নে মূসা (রেজা) (আঃ)-এর শপথ (১২) ইমাম মুহাম্মদ ইব্নে আলী (আল-জাওয়াদ, আল-ত্বাকী) (আঃ)-এর শপথ (১৩) ইমাম আলী ইব্নে মুহাম্মাদ (আল হাদী, আন নাক্বী) (আঃ)-এর শপথ (১৪) ইমাম হাসান ইব্নে আলী (আল-আসকারী) (আঃ)-এর শপথ (১৫) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল হুজ্জাত (আল-মাহ্দী) (আঃ ফাঃ)-এর শপথ।

(৬) অতঃপর সম্ভব হলে ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর যিয়ারত পাঠ করা।
(৭) শবে ক্বদরের সন্ধানে রাত্রের অধিকাংশ সময়ে জাগ্রত থেকে বিভিন্ন আমল করা। কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা। অতীতে নিজের জ্ঞাত-অজ্ঞাত অন্যায় কৃত-কর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। নিজের মনোবাসনা জানিয়ে আল্লাহর দরবারে আবেদন করা। আল্লাহর নিকট নিজের ক্ষমা ও নিস্কৃতির জন্য মোনাজাতের মাধ্যমে কাকুতি-মিনতি জ্ঞাপন করা।
(৮) সম্পূর্ন রমযান মাসে যে ১০০০ (এক হাজার) রাকাত মুস্তাহাব নামায পড়া হয়। তার মধ্যে শবে ক্বদর বাদে অন্য রাতসমূহে পড়া হয় ৭০০ রাকাত। আর বাকি ৩০০ রাকাত নামায শবে ক্বদরের রাতসমূহে পড়া। এর মধ্যে ১৯শে রমযানের রাত্রে ১০০ রাকাত পড়া।
(৯) এই দোয়াটি পড়তে হবে : দোয়াটি হযরত কাফয়ামী (রহঃ) ইমাম যয়নুল আবেদীন (আঃ) হতে বর্ণনা করেছেন : [সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩৭২; হযরত সৈয়দ ইবনে তাউস (রহঃ), ইক্‌বালুল আমল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৮-৩৪৯]।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَمْسَیْتُ لَكَ عَبْدًا دَاخِرًا لَآ اَمْلِكُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا
وَّلَآ اَصْرِفُ عَنْهَا سُوْٓءًا اَشْهَدُ بِذٰلِكَ عَلٰی نَفْسِیْ وَاَعْتَرِفُ لَكَ
بِضَعْفِ قُوَّتِیْ وَقِلَّةِ حِیْلَتِیْ فَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْجِزْ لِیْ
مَا وَعَدْتَّنِیْ وَجَمِیْعَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ فِیْ هٰ
ذِهِ اللَّیْلَةِ وَاَتْمِمْ عَلَیَّ مَآ اٰتَیْتَنِیْ فَاِنِّیْ عَبْدُكَ الْمِسْكِیْنُ الْمُسْ
تَكِیْنُ الضَّعِیْفُ الْفَقِیْرُ الْمَهِیْنُ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِیْ نَاسِیًا لِذِكْرِكَ فِیْمَا
اَوْلَیْتَنِیْ وَلَا لِاِحْسَانِكَ فِیْمَآ اَعْطَیْتَنِیْ وَلَآ اٰیِسًا مِنْ اِجَابَتِكَ وَاِنْ
اَبْطَاَتْ عَنِّیْ فِیْ سَرَّآءَ اَوْ ضَرَّآءَ اَوْ شِدَّةٍ اَوْ رَخَآءٍ اَوْ عَافِیَةٍ اَوْ
بَلَآءٍ اَوْ بُؤْسٍ اَوْ نَعْمَآءَ اِنَّكَ سَمِیْعُ الدُّعَآءِ .

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আমসাইতু লাকা আবদান দাখিরান, লা আমলিকু লিনাফসী নাফআও ওয়ালা দাররান। ওয়ালা আসরিফু আনহা সূআন, আশহাদু বিযালিকা আলা নাফসী। ওয়া আ'তারেফু লাকা বিদা'ফি কূওয়াআতী, ওয়া ক্বিল্লাতী হীলাতী, ফাসাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মদ। ওয়া আনজিযলী মা ওয়া আততানী ওয়া জামীয়াল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি মিনাল মাগফিরাতী ফীহাযিহিল লাইলাতী। ওয়া আতমিম আলাই-ইয়া মা আতাইতানী। ফা ইন্নী আবদুকাল মিসকীনুল মুসতাকীনু আদ্‌দায়ীফুল ফাক্বীরুল মাহীন। আল্লাহুম্মা লা তাজআলনী নাসিয়ান লিযিকরিকা ফীমা আওলাইতানী। ওয়া লা লিইহ্‌সানিকা ফীমা আ'তায়তানী, ওয়ালা আয়িসান মিন ইজাবাতিকা ওয়া ইন আবতাআত আন্নী, ফী সার্‌রাআ আউ দার্‌রাআ, আউ শিদ্দাতিন আউ রাখায়িন, আউ আফিয়াতীন আউ বালায়িন, আউ বু'উসিন, আউ না'মাআ, ইন্নাকা সামীউদ দুয়ায়ি।)

অর্থ : "হে আল্লাহ! নিশ্চিতরূপে আমি তোমার একজন অপদস্থ বান্দা হয়ে এ সন্ধ্যা অতিবাহিত করেছি। হে আল্লাহ! আমার (সত্তা বা নাফসের) লাভ-লোকসানের আমি নিজে মালিক নই এবং আমি তার (সত্তা বা নাফসের) মন্দের পরিবর্তন করতে পারি না। এমতাবস্থায় আমি আমার ঐ সত্তার উপর সাক্ষী দিচ্ছি এবং তোমার কাছে স্বীকার করছি আমার দূর্বল শক্তি, অসহায়ত্ব ও নিঃস্বতার কথা। অতএব, তুমি মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পবিত্র বংশধরগণের উপর অফুরন্ত শান্তি বর্ষণ কর। এবং তুমি এ রজনীতে ক্ষমা মার্জনার যে অঙ্গীকার আমাকে এবং মু'মিন নর-নারীদের দিয়েছ তা সম্পর্ন কর। এবং যা কিছু আমাকে দান করেছে তা পূর্ণ কর। যেহেতু, আমি তোমার একজন নিঃস্ব, নগন্য, দূর্বল মুখাপেক্ষী বঞ্চিত দাস। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ভুলে যেওনা তোমার স্মরণ থেকে যা আমাকে অস্তিত্ব দিয়েছে এবং তুমি তোমার অনুগ্রহ (থেকে) আমাকে কখনো বঞ্চিত করো না; যা তুমি আমাকে দান করেছো। এবং প্রার্থনা মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে আমাকে নিরাশ করনা। যদিও আমার কাছ থেকে কোন অমনোযোগিতা হয়ে থাকে। (তা যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন), গোপনীয় ক্ষেত্রে বা ক্ষতি লোকসানের সময়ে বা দূর্ভিক্ষে বা সুখ-স্বাচ্ছ্যন্দে বা শান্তির সময়ে বা আপদ-বিপদে অথবা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে অথবা আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে। কেননা নিঃসন্দেহে তুমি প্রার্থনা (আর্তনাদ) শ্রবণকারী।"

১৯শে রাত্রের বিশেষ আমল :

(১) ১০০ বার বলতে হবে : (সূত্রঃ মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩৭৩)

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ .

(আস্তাগ্‌ফিল্লাহা রাব্বী ওয়া আতূবু ইলাইহি।)

অর্থ : "আমি আমার মহান প্রভু আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী ও আমি অনুতপ্ত।"

(২) ১০০ বার বলতে হবে : (সূত্রঃ মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩৭৩)

اَللّٰهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

(আল্লাহুম্মাল আন ক্বাতালাতা আমীরুল মুমীনিন)

অর্থ : "হে আল্লাহ! লানত (অভিশাপ, অপমান, লাঞ্ছনা, ভর্ৎসনা) বর্ষণ কর মু'মিন বা বিশ্বাসীদের নেতা [হযরত আলী (আঃ)] এর হত্যাকারীর উপর।"

(৩) ক্বদরের রাতসমূহে প্রতি দু' রাকাত নফল নামাযের পর এ দোয়া পড়তে হবে। তবে প্রতিরাতে তাহাজ্জুদ নামাযে প্রতি দু' রাকাতের পর এ দোয়া পড়া যায়। [সূত্র : মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩৭৩; হযরত সৈয়দ ইবনে তাউস (রহঃ), ইক্‌বালুল আমল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৮]।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْمَا تَقْضِيْ وَتُقَدِّرُ مِنَ الْاَمْرِ الْمَحْتُوْمِ وَفِيْمَا تَفْرُقُ مِنَ الْاَمْرِ الْحَكِيْمِ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْقَضَاءِ الَّذِيْ لَا يُرَدُّ وَلَا يُبَدَّلُ اَنْ تَكْتُبَنِيْ مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبْرُوْرِ حَجُّهُمُ الْمَشْكُوْرِ سَعْيُهُمُ الْمَغْفُوْرِ ذُنُوْبُهُمُ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَاجْعَلْ فِيْمَا تَقْضِيْ وَتُقَدِّرُ اَنْ تُطِيْلَ عُمْرِيْ وَتُوَسِّعَ عَلَيَّ فِيْ رِزْقِيْ وَتَفْعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا .

(আল্লাহুম্মাজ আল ফীমা তাকদ্বী। ওয়া তুকাদ্দিরু মিনাল আমরিল মাহতূম। ওয়া ফীমা তাফরুকু মিনাল আমরিল হাকীমি ফী লাইলাতিল ক্বাদ্‌রি। ওয়া ফীল ক্বাদায়িল লাযী লা ইউ রাদ্দু ওয়ালা ইউ বাদ্দালু আন তাকতুবানী মীন হুজ্জাজি বাইতিকাল হারামিল মাবরূরি হাজ্জুহুমুল মাশকূরি, সা'ইউহুমুল মাগফূরি জুনূবুহুমুল মোকাফফারি আনহুম সায়্যি আতুহুম ওয়াজ আল ফীমা তাকাদ্বী ওয়া তুকাদ্দিরু আন তুত্বীলা উমরী ওয়াতু ওয়াস্‌সিয়া আলাইয়া ফী রিয্‌ক্বী ওয়া তাফআলা বী কাযা ওয়া কাযা।)।

অর্থ : "হে আল্লাহ! তোমার চূড়ান্ত আদেশ দ্বারা (আমার ভাগ্যলিপি)

তকদিরকে নির্ধারণ কর। এবং ক্বদরের রজনীতে তোমার পান্ডিত্যপূর্ণ রায়ের মাধ্যমে যা তুমি পৃথক (ভাল-মন্দ) কর। আর তোমার এ রায়সমূহ এমনই যার কোন পরিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন নেই। (এ কারণে তোমার কাছে বিনীত অনুরোধ আমার) আমার নামটি তোমার গৃহের হাজীদের সাথে স্থান দাও, যাদের হজ্জ প্রশংসিত, যাদের সা'য়ী (প্রদক্ষিণ) মূল্যায়িত হয়, যাদের পাপসমূহ মোচিত এবং যাদের নোংরা কুৎসিত কর্মকান্ড কাফফারাহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এবং আমার তক্বদিরে সেটাই নির্ধারণ কর যা আমার দীর্ঘআয়ু বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। আর আমার রিযিকের পথ সম্প্রসারিত করে দাও অধিক পরিমাণে এবং তুমি আমার (কল্যাণের জন্য) যাহা কিছু চাও তাহা কর।" (এর পর নিজের জন্য দোয়া পড়তে হবে নিজ ভাষায়।)।

(৪) দোয়া-ই জাওশান কাবীর পড়া। সম্ভব হলে আরো বিভিন্ন দোয়া পড়া। যেমনঃ দোয়া-ই কুমাইল, যিয়ারতে আশুরা ইত্যাদি পাঠ করা।

(৫) সম্ভব হলে সূরা রূম, আনকাবুত, দুখান, হাশর ইত্যাদি পাঠ করা।

২১শে রাত্রের বিশেষ আমল :

১৯শে রাত্রের চেয়ে ২১শে রাত্রের মর্যাদা আরো বেশী। আবার ২১ অথবা ২৩-এর মধ্যে একটি রাত্র হচ্ছে শবে ক্বদর বলে মনে করা হয়। মা'সূমগণের (আঃ) কাছে প্রশ্ন করা হল যে, এ দু রাত্রের মধ্যে কোনটি ক্বদরের রাত্র? তাঁরা কোন জবাব না দিয়ে বলেনঃ দু'টি রাতই অতি মর্যাদাসম্পন্ন।

(১) ১০০ বার বলতে হবে : (সূত্রঃ মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩৭৩)

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ .

(আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী ওয়া আতূবু ইলাইহি।)

অর্থ : "আমি আমার মহান প্রভু আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী ও আমি অনুতপ্ত।"

(২) ১০০ বার বলতে হবে : (সূত্রঃ মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩৭৩)

اَللّٰهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

(আল্লাহুম্মাল আন ক্বাতালাতা আমীরুল মু'মিনীন)

অর্থ : "হে আল্লাহ! লানত (অভিশাপ, অপমান, লাঞ্ছনা, ভর্ৎসনা) বর্ষণ কর মু'মিন বা বিশ্বাসীদের নেতা [হযরত আলী (আঃ)] এর হত্যাকারীর উপর।"

(৩) উপরোক্ত ১৯শে রমযান রাত্রের বিশেষ আমল এর ৩নং দোয়াটি পড়া।

(৪) দোয়া-ই জাওশান কাবীর পড়া। আর সম্ভব হলে আরো বিভিন্ন দোয়া। যেমনঃ দোয়া-ই কুমাইল, যিয়ারতে আশুরা ইত্যাদি পাঠ করা।

(৫) সম্ভব হলে সূরা রূম, আনকাবুত, দুখান, হাশর ইত্যাদি পাঠ করা।

(৬) সূরা ক্বাদর (ইন্না আনযালনা-হু ফী লাইলাতিল ক্বাদর) পড়া।

২৩শে রাত্রের বিশেষ আমল :

(১) ১০০ বার বলতে হবে : اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ .

(আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী ওয়া আতূবু ইলাইহি।)

অর্থ : "আমি আমার মহান প্রভু আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী ও আমি অনুতপ্ত।"

(২) এই দোয়া পড়তে হবে : উপরোক্ত ১৯শে রমযান রাত্রের বিশেষ আমল এর ৩নং দোয়াটি।

(৩) দোয়া-ই জাওশান কাবীর পড়া। সম্ভব হলে আরো বিভিন্ন দোয়া পড়া। যেমনঃ দোয়া-ই কুমাইল, যিয়ারতে আশুরা ইত্যাদি পাঠ করা।

(৪) সম্ভব হলে সূরা রূম, আনকাবুত, দুখান, হাশর ইত্যাদি পাঠ করা।

(৫) ২৩শে রাত্রের এ বিশেষ দোয়াটি পড়া : [সূত্রঃ মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩৭৮; হযরত সৈয়দ ইবনে তাউস (রহঃ), ইক্‌বালুল আমল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৭৮]।

يَا رَبَّ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَجَاعِلَهَا خَيْرًا مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ وَرَبَّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَالظُّلَمِ وَالْاَنْوَارِ وَالْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ يَا بَارِئُ يَا
مُصَوِّرُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا اَللّٰهُ يَا قَيُّوْمُ يَا اَللّٰهُ
يَا بَدِيْعُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ لَكَ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى وَالْاَمْثَالُ الْعُلْيَا
وَالْكِبْرِيَآءُ وَالْاَلَآءُ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ
تَجْعَلَ اسْمِيْ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَآءِ وَرُوْحِيْ مَعَ الشُّهَدَآءِ وَاِحْسَا
نِيْ فِيْ عِلِّيِّيْنَ وَاِسَآئَتِيْ مَغْفُوْرَةً وَاَنْ تَهَبَ لِيْ يَقِيْنًا تُبَاشِرُ بِهِ
قَلْبِيْ وَاِيْمَانًا يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّيْ وَتُرْضِيَنِيْ بِمَا قَسَمْتَ لِيْ وَاٰتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الْحَرِيْقِ
وَارْزُقْنِيْ فِيْهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَالرَّغْبَةَ اِلَيْكَ وَالْاِنَابَةَ وَالتَّوْبَةَ
وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّدًا وَاٰلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .

(ইয়া রাব্বি লাইলাতিল ক্বাদরি, ওয়া জা'য়িলাহা খাইরামমিন আলফি শাহ্‌র। ওয়া রাব্বাল লাইলি ওয়ান নাহার, ওয়াল জিবালি ওয়াল বিহার, ওয়াজ জুলামে ওয়াল আনওয়ার, ওয়াল আরদ্বি ওয়াস সামায়ি, ইয়া বারিয়ু, ইয়ামুসাব্বিরু, ইয়া হান্নানু, ইয়া মান্নানু, ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া আল্লাহু, ইয়া ক্বায়্যূমু, ইয়া আল্লাহু, ইয়া বাদীয়ু, ইয়া আল্লাহু, ইয়া আল্লাহু, ইয়া আল্লাহু, লাকাল আসমা উল হুসনা, ওয়াল আমছালুল উলইয়া, ওয়াল কিবরিইয়ায়ু, ওয়াল আলাউ, আসআলুকা আন তুসাল্লী আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ, ওয়া আন তাজআ'লাসমী ফী হাযিহিল লাইলাতি ফীস্‌সুআ'দায়ি, ওয়ারূহী মাআশ শুহাদায়ি, ওয়া ইহসানী ফী ইল্লীয়ীনা, ওয়া ইসাআতী মাগফূরাতা, ওয়া আন তাহাবালী ইয়াক্বীনান তুবাশিরু বিহি ক্বালবী, ওয়া ঈমানান, ইউজহিবুশ-শাক্কা আন্নী, ওয়া তুরদ্বিইয়ানী, বিমা ক্বাসামতালী, ওয়া আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়া ক্বিনা আযাবান নারিল হারীক্ব। ওয়ার যুক্বনী ফীহা, যিকরাকা ওয়া শুকরাকা, ওয়াররাগবাতা ইলাইকা, ওয়াল ইনাবাত ওয়াততাওবাতা, ওয়াততাওফীক্বা লিমা, ওয়াফফাক্বতা লাহু মুহাম্মাদাও ওয়া আলা মুহাম্মাদ আলাইহিমুস সালাম।)

অর্থ : "হে শবে ক্বদরের প্রতিপালক ও উহাকে হাজার রজনীর থেকে উত্তম সৃষ্টিকারী। এবং দিবা-রাত্রি, পাহাড়-পর্বতমালা, সমুদ্র, আলো-আঁধার, আসমান-জমিন সমূহের প্রতিপালক। হে সর্বোচ্চ উদ্ভাবক, হে পরম ক্ষমাশীল, হে পরম দয়ালু, হে আল্লাহ, হে মার্জনাকারী, হে আল্লাহ, হে চিরস্থায়ী, হে আল্লাহ, হে সৃষ্টিকর্তা, হে আল্লাহ, হে উদ্ভবকারী, হে আল্লাহ, হে আল্লাহ, হে আল্লাহ। সর্বশ্রেষ্ঠ নামসমূহ, উচ্চতর দৃষ্টান্তসমূহ, বড়ত্ব এবং মহত্ব একান্ত তোমারই। তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা হল মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর বংশের উপর রহমত বর্ষণ কর। এবং এ রজনীতে আমার নামটি শামিল কর সৌভাগ্যবানদের তালিকায় এবং আমার রুহকে শামিল কর শহীদদের দলে এবং আমার নেকীসমূহ শামিল কর রহমতের সর্বোচ্চ স্থান অর্জনকারীদের দলে এবং মন্দসমূহকে ক্ষমাপ্রাপ্তদের সাথে। এবং আমাকে বিশ্বাস প্রদান কর যাহা সরাসরি আমার অন্তরে স্থান পায়। এবং আমাকে ঈমান দাও যাহা সন্দেহকে আমার থেকে দূর করে। এবং আমার থেকে তুমি সন্তুষ্ট হও যাহা তুমি আমার ভাগ্যতে লিখেছো। এবং আমাকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতের নৈকট্য প্রদান কর। এবং আমাকে রক্ষা কর তোমার দগ্ধকারী আগুন থেকে। এবং এ মাসে সার্বক্ষণিক তোমার স্মরণ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তোমার প্রতি উদ্ভূততা ও তৌফিক প্রদান কর এবং তোমার সান্নিধ্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন, অনুশোচনা এবং সফলতা যাহা মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশগণের উপরে দাঁড় করেছ। তাঁদের উপর অগণিত শান্তি বর্ষণ কর।"

ই'তিকাফ

ই'তিকাফ শব্দের আভিধানিক অর্থ স্থির থাকা, কোন স্থানে বদ্ধ হয়ে থাকা বা অবস্থান করা, কোন বস্তুর ওপর স্থায়ীভাবে থাকা। পারিভাষিক অর্থে ই'তিকাফের দিনগুলোতে মসজিদে অবস্থান করা। অর্থাৎ কতকগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে জাগতিক কাজকর্ম ও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। 'মসজিদ' শব্দটি 'সিজ্‌দা' ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভুত, যার অর্থ সিজ্‌দা করার স্থান। শরীয়তের পরিভাষায় মসজিদ হচ্ছে ঐ স্থান যে স্থানকে জমির মালিক 'আমি এ স্থানটি মসজিদের জন্য দিয়ে দিলাম'-বলার দ্বারা মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেয়। রাস্তা পৃথক করে দেয় এবং অনুমতি দেয় সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে তথায় নামায পড়ার জন্য। সেখান থেকে মালিকের সর্বপ্রকার স্বত্ব ও মালিকানা এক আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়। তখন মসজিদ হয় আল্লাহর ঘর এবং দুনিয়ার সর্বত্তোম ঘর, মুসলমানদের ইবাদত করার স্থান। সূরা বাকারাহ এর ১৮৭ নং আয়াতে ই'তিকাফের স্থান হিসেবে 'ফিল মাছাজ্বিদ' বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, ই'তিকাফ যে কোন মসজিদেই হতে পারে। কেননা এখানে মসজিদ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমাজ সংশোধনের এক বিশাল দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেয়ার পরও এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রবল বিরোধীতার মূখেও ই'তিকাফের ন্যায় মহান ইবাদাত থেকে নিজেকে কখনো দূরে সরিয়ে রাখেননি। ই'তিকাফ কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। তবে কেবলমাত্র ঐ সময়ই ই'তিকাফ করা যায় যখন শরীয়তের বিধান অনুযায়ী রোযা রাখার নির্দেশ রয়েছে। তবে রমযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফের অত্যধিক গুরুত্ব রয়েছে। ই'তিকাফের অন্যতম উদ্দেশ্য পবিত্র 'লায়লাতুল-কাদর'-এর তালাশ এবং এ পবিত্র বরকতময় রাতের পুণ্যের ভাগী হওয়া।

"নবী (সাঃ) প্রতি বছর দশ দিন (রমযানের শেষ দশ) ই'তিকাফ করতেন। তবে তিনি যে বছর ইন্তেকাল করেন, সে বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেন। প্রতি বছর (রমযান মাসে) তাঁর কাছে একবার কুরআন পেশ করা হয়। তবে তিনি যে বছর ইন্তেকাল করেন, সে বছর তাঁর কাছে তা দু'বার পেশ করা হয়।" (সূত্র : সুনানু ইবনে মাজাহ্‌, ইফাবা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-১৭৬৯, পৃষ্ঠা-১২৫)।

ই'তিকাফ সম্পর্কে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন, "রমযান মাসের এক দশক (দশদিন) ই'তিকাফ পালন করা দু'টি হজ্জ ও দু'টি ওমরার সওয়াবের সমান।" আর মা'সুম ইমামগণের সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুযায়ী,

মাহে রমযানের শেষ দশ দিনে মসজিদে ই'তিকাফ করা মুস্তাহাব। হযরত রাসূল আকরাম (সাঃ) জীবনভর এরূপ করেছেন। (সূত্র : ওয়াসায়েলুশ শী'য়াহ্, ৭খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৭)।

"নবী (সাঃ) যখন ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করার পর ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করতেন। একবার তিনি রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর নির্দেশে তাঁর জন্য একটি বেষ্টনী তৈরী করা হলো।" (সূত্র : সুনানু ইবনে মাজাহ্, ইফাবা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-১৭৭১, পৃষ্ঠা-১২৬)।

ই'তিকাফের শর্তাবলী :

(১) যে ব্যক্তি ই'তিকাফে বসবে তাকে অবশ্যই বুদ্ধিমান ও সচেতন হতে হবে এবং ই'তিকাফ একটি মুস্তাহাব আমল।

(২) নিয়্যত : ইখলাসের সাথে আল্লাহর নৈকট্যলাভ বা হাসিলের জন্য ই'তিকাফের নিয়্যত করতে হবে।

(৩) রোযা রাখতে হবে : ৩ (তিন) থেকে ১০ (দশ) দিন ই'তিকাফের নিয়্যতে মসজিদ অবস্থান করবে এবং যতদিন মসজিদ অবস্থান করবে ততদিন রোযা রাখিতে হবে।

(৪) ই'তিকাফ তিন দিনের কম হলে চলবে না; ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে তিন দিন এবং সর্বোচ্চ কোন সীমা নেই।

(৫) নিম্নের মসজিদ সমূহের যে কোন একটিতে ই'তিকাফের স্থান বা জায়গায় হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। যেমন- মসজিদুল হারাম, মসজিদুন নব্বী, মসজিদে কুফা, মসজিদে বসরা উল্লেখ্যযোগ্য। তবে একদল ফকিহগণের মতে, প্রত্যেক শহর বা অঞ্চলের যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাত হয় সেসব মসজিদেই ই'তিকাফে থাকার তাকিদ রয়েছে। যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নিয়মিত জামাতসহ নামায আদায় হয় তাকে পাঞ্জেগানা মসজিদ এবং যেখানে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতসহ জুম'আর জামাত হয় তাকে জামে মসজিদ বলে।

(৬) অভিভাবকের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া। যেমন- ই'তিকাফ যদি স্বামীর অধিকারকে খর্ব করে তাহলে স্ত্রীকে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। তাছাড়া যে সকল মসজিদে মহিলাদের নামায আদায়ের বিশেষ ব্যবস্থা আছে সেই সকল মসজিদে মহিলারা ই'তিকাফ করতে পারবে। সন্তানরা ই'তিকাফে বসলে যদি পিতা-মাতার জন্য কষ্টের কারণ হয় তাহলে সন্তানদেরকে পিতা-মাতার অনুমতি নিতে হবে।

(৭) মসজিদে অবস্থান করা এবং মসজিদ থেকে বাহির না হওয়া। ই'তিকাফের দিনগুলোকে আল্লাহর যিকিরের জন্য নির্দিষ্ট করা। তবে ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় নিজের মানবিক ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য মসজিদের

বাইরে যাওয়া যায় কিন্তু ই'তিকাফের দিনগুলোতে যৌন সম্ভোগ থেকে নিজেকে সর্বদা দূরে রাখা এবং সার্বক্ষণিক মসজিদে অবস্থান করে ইবাদত বন্দেগী ও আত্মশুদ্ধিতেই মগ্ন থাকা। নিজ সত্তাকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যে আটকিয়ে রাখা। একাগ্রতার সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সাধনা করা। মানবিক প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ হতে বাইরে না যাওয়া।

ই'তিকাফের বিধি-বিধান :

(১) ই'তিকাফের নিয়্যতের সময় : ই'তিকাফের নিয়্যত ফজরের আযানের সময় থেকে করতে হবে। সুতরাং কেউ যদি দেরিতে মসজিদে পৌছায় তাহলে সে ঐ দিন থেকে ই'তিকাফে বসতে পারবে না।

(২) মুস্তাহাব ই'তিকাফ ১ম ও ২য় দিনে পরিত্যাগ করা যায় কিন্তু দু'দিন পূর্ণ হয়ে গেলে তৃতীয় দিনের ই'তিকাফ ওয়াজিব হয়ে যায় এবং পরিত্যাগ করা যাবে না।

(৩) যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদ থেকে বাহির হয়ে আসে তাহলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে বের হলে তা বাতিল হবে না। যেমন- (ক) প্রস্রাব-পায়খানা ও গোসলের জন্য। (খ) সত্য স্বাক্ষ্য দেয়ার জন্য। (গ) কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার জন্য। (ঘ) জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা জন্য। (ঙ) কাউকে বিদায় দেয়ার জন্য। (চ) কাউকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্য।

(৪) যদি প্রয়োজনের তাগিদে মসজিদ থেকে বাহিরে যাওয়া হয় তাহলে নিকটতম পথকে বেছে নিতে হবে এবং প্রয়োজনের বেশী সময় বাইরে থাকতে পারবে না। কোথাও বসতে পারবে না। ছায়া দিয়ে যেতে পারবে না এবং কোন ছায়ার নীচে বিশ্রামও নিতে পারবে না।

ই'তিকাফে যা হারাম :

(১) যৌন সংক্রান্ত বিষয়াদি থেকে দূরে থাকা। যেমন- চুমু খাওয়া, সহবাস করা। (২) হস্তমৈথুন করা। (৩) কেনা-বেচা থেকে বিরত থাকা। (৪) ব্যবসা-বানিজ্য থেকে বিরত থাকা। (৫) ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকা। এমন কি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য কোন ইসলামী বিষয় নিয়ে আলোচনা করাও অবৈধ।

যাকাত

'যাকাত' একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, বরকত লাভ করা, প্রশংসা করা ইত্যাদি। পবিত্র আল-কুরআনে সূরা রুমের ৩৯নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যাকাত দেয় তাদের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পায়।" শরীয়তের পরিভাষায় 'যাকাত' বলা হয় 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদের মালিক কর্তৃক বছরান্তে তার নির্দিষ্ট সম্পদের একটি অংশ যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে প্রদান করা। সূরা তাওবার ৬০নং আয়াত অনুযায়ী দ্বীন ইসলামের ওয়াজিব (অত্যাবশ্যকীয়) বিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো 'যাকাত' প্রদান করা। যাকাত দু'ধরনের: যাকাতুল মাল (সম্পদের যাকাত) ও যাকাতুল ফিতর বা সাদাকাতুল ফিত্‌র (শরীরের যাকাত)। সূরা তাওবার ৬০নং আয়াত অনুযায়ী যারা সাধারণ যাকাতের হকদার তারাই যাকাতুল ফিতরের হকদার। নিম্নে যাকাতুল ফিতর অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হয়েছে।

'ইমামীয়া বা জাফরী মাযহাব' এর মতে নামাযের পরেই যাকাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটা এতবেশী গুরুত্বপূর্ণ যে আহলে বাইতের পবিত্র ইমাম (আঃ) গণের কোন কোন বর্ণনায় বলা হয় যে, "যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করে না তার নামায কবুল হয় না।" এ মাযহাব নয়টি বিষয়ে যাকাত দেয়াকে ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) মনে করে। এগুলো হচ্ছে- তিন প্রকার চতুস্পদ জন্তু। যেমন- (১) ভেড়া, (২) গরু এবং (৩) উট। চার প্রকার দানা ফসল। যেমন- (১) গম, (২) জব, (৩) খেজুর, (৪) শুষ্ক আঙ্গুর। এবং (১) স্বর্ণ মুদ্রা (২) রৌপ্য মুদ্রা। কিছুকিছু ক্ষেত্রে যেমন পণ্যসামগ্রী, ঘোড়া এবং কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত সকল দ্রব্যের উপর যাকাতকে মুস্তাহাব করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত নয়টি দ্রব্যের উপর বাধ্যতামূলক যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের সম্পদের নিসাবের পরিমাণ ও যাকাতের হারও স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত রয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, 'ইমামীয়া বা জাফরী মাযহাব' এর ফিকাহ অনুযায়ী, স্বর্ণ ও রৌপ্য যদি মুদ্রা আকারে হয়, কেবল তখনই তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত বা অলংকারের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অন্যদিকে অর্থের প্রতিনিধিত্বকারী কাগজপত্র যেমন- কাগজের নোট, চেক, বন্ড ইত্যাদিতে যাকাত ওয়াজিব নয়। এতে খুমস ওয়াজিব অর্থাৎ বাৎসরিক ব্যয়ের পর যা অতিরিক্ত থাকবে তার এক-পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে। যাকাত বছরের যে কোন সময় মুকাল্লাফ (যার ওপর ওয়াজিব হয়েছে) ব্যক্তির সুবিধা অনুযায়ী বাৎসরিক তারিখ নির্দিষ্ট করে আদায় করতে হয়। এগুলোর সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং যাকাতের অন্য বিষয়গুলি আমাদের মাযহাবের কিতাবাদিতে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে যা আমরা সেখান থেকে জেনে নিতে পারি।

যাকাত পাওয়ার হকদার (অধিকারী) :

পবিত্র আল-কুরআনে সূরা যারিয়াত এর ১৯নং আয়াতে সম্পদশালীদের সম্পদে দরিদ্রদের প্রকৃত অংশীদার গণ্য করেছে। আয়াতে বলা হয়েছে- "আর তাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদের হক।" যাকাতের হকদারগণ আট শ্রেণীর যা পবিত্র আল-কুরআনে সূরা তাওবার ৬০নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত অনুযায়ী যারা সাধারণ যাকাতের হকদার তারাই যাকাতুল ফিত্‌রের হকদার। যাকাতের হকদারগণ আট শ্রেণীর। আর তারা হলো আল-কুরআনের ভাষায়- "যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্থদের জন্যে, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে- এই হল আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান।" (সূরা তাওবা-৬০)।

(১) দরিদ্র (ফকীর) :

শরীয়তের দৃষ্টিতে ফকীর বা দরিদ্র হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নিজের ও পরিবার-পরিজনের বাৎসরিক প্রয়োজন পূরণের মত সম্পদের অধিকারী নয়।

(২) মিসকিন :

যে ব্যক্তির অবস্থা ফকীরের চেয়েও খারাপ সেই ব্যক্তি মিসকিন।

(৩) যাকাত আদায়ের কর্মীগণ : যাকাত আদায়ের কর্মীগণ হলেন, যারা স্ব স্ব মারজা বা তার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে যাকাত আদায়ের জন্য পরিশ্রম করে।

(৪) যাদের অন্তরকে জয় করার প্রয়োজন আছে :

'আল মুয়াল্লাফাতু কুলূবুহুম' (যাদের অন্তরকে জয় করার প্রয়োজন আছে) বলতে সেই লোকদেরকে বোঝায় যাদেরকে ইসলামের স্বার্থে যাকাত থেকে একটি অংশ দেয়া যাবে যারা যাকাতের অর্থ পেলে পরে ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে যাবে। 'মুয়াল্লাফাতু কুলূবুহুম' অংশের যাকাত মুসলিম-অমুসলিম উভয়কেই দেয়া যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে, এ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ হাসিল হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দয়া ও সদাচরণ থেকে কাউকে বঞ্চিত করতেন না। এমনকি মোনাফিক এবং 'মুয়াল্লাফাতু কুলূবুহুম' দেরকেও না। কিন্তু তাদের প্রতি সতর্কাবস্থা তিনি কখনই বর্জন করেননি।

(৫) ক্রীতদাসের জন্য :

ক্রীতদাসের জন্য যাকাত দেয়ার অর্থ হচ্ছে মুক্তিমূল্য দিয়ে ক্রীতদাসকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়া। এ যুগে এ হুকুমটি কার্যকরী করার কোন ক্ষেত্র অবশিষ্ট নেই।

(৬) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিগণ :

এখানে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা কোন পাপ কাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্য ছাড়াই ঋণ করেছে এবং তা পরিশোধ করতে পারছে না। তাদেরকে ঋণমুক্ত করার জন্য যাকাত দিতে হবে।

(৭) আল্লাহর পথ (সাবিলিল্লাহ্) :
'আল্লাহর পথ' বা 'সাবিলিল্লাহ্' কথাটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এতে যুদ্ধসহ, মসজিদ, হাসপাতাল ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণকর সব কিছু শামিল রয়েছে।

(৮) পথিক (ইবনুস সাবিল) :
'পথিক' বা 'ইবনুস সাবিল' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যার সফরের খরচ শেষ হয়ে গেছে, আর খরচের অভাবে নিজের দেশে পৌছাতে পারছে না এবং ঋণ করে কিংবা কোন বস্তু বিক্রি করেও খরচ যোগাড় করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তাকে ঐ পরিমাণ যাকাত দেয়া জায়েজ যাতে সে তার দেশে পৌছাতে পারে।

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু বিষয় :
(১) বনি হাশিমের (হাশিম বংশের লোকদের) জন্য বনি হাশিম বহির্ভূত লোকদের পক্ষ থেকে দেয় সব ধরনের যাকাত হারাম। তবে তাদের নিজেদের মধ্যে একজনের যাকাত অন্যজনের জন্য হালাল।

(২) একজন মিসকিনকে পুরো যাকাত প্রদান করা জায়েজ আছে, এমনকি এর ফলে সে ধনীতে পরিণতও হয়ে যায়। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তাকে একবার তা দিতে হবে, বার বার নয়। অর্থাৎ স্বচ্ছল হয়ে গেলে আর নয়।

(৩) যার জন্য যাকাত ওয়াজিব তার জন্য পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনী ও নিজ স্ত্রীকে যাকাত দেয়া জায়েজ নয়। নিজের আর্থিক সামর্থ থাকলে ঐ সকল ব্যক্তিদের দৈনন্দিন খরচ বহন করা তার ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর দরিদ্র পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুত্রের ওপর ওয়াজিব এবং দরিদ্র সন্তান পুত্র হোক অথবা কন্যা এর ভরণ-পোষণ পিতার প্রতি ওয়াজিব।

(৪) তবে ভাই, চাচা ও মামাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েজ। যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে গরীব আত্মীয়দেরকে অগ্রাধীকার দিতে হবে। যাকাতদাতার ওপর ভরণ-পোষণ বহন করা ওয়াজিব নয় এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাদের যাকাত প্রদান করা অধিকতর উত্তম। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মিসকীনকে সাদকা দিলে একটি সাদকার সওয়াব পাওয়া যাবে। আর আত্মীয়কে সাদকা দিলে দু'টি সাদকার সওয়াব পাওয়া যাবে; একটি সাদকার এবং অপরটি আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার।" (সূত্র : সুনানু ইবনে মাজাহ্, ইফাবা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-১৮৪৪, পৃষ্ঠা-১৫৮; তিরমিযী শরীফ, ইফাবা, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-৬৫৫, পৃষ্ঠা-৩৬)।

(৫) সম্পদের যাকাত অথবা শরীরের যাকাত (ফিত্‌রা) যে জাকাতই হোক, আদায় করার সময় যাকাতের নিয়্যত এবং আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের নিয়্যতে আদায় করতে হবে।

খুম্‌স

'খুম্‌স' এর আভিধানিক অর্থ হলো এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ মালের পঞ্চম ভাগের একভাগকে 'খুম্‌স' বলে। প্রত্যেক মুসলমানদের উপর খুম্‌স ওয়াজিব, যার 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদ আছে। সূরা আনফালের ৪১নং আয়াতে বলা হয়েছে, "জেনে রাখ, যা তোমরা গনিমত হিসেবে পাও তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর (রাসূলের) নিকটাত্মীয় এবং ইয়াতীম, মিসকীন এবং পথিকদের জন্য (ইবনুল সাবিল)।" দ্বীন ইসলামের ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) বিধানগুলোর মধ্যে নীচের সাতটি বিষয়ে 'খুম্‌স' প্রদান করাকে 'ইমামীয়া বা জাফরী মাযহাব' অন্যতম বলে মনে করে। এগুলো হলো- (১) যুদ্ধলব্ধ গনিমত, (২) সমুদ্রে ডুব দিয়ে যে সম্পদ আহরণ করা হয়, (৩) গুপ্তধন, (৪) খনিজদ্রব্য, (৫) বৈধ সম্পদের সাথে অবৈধ সম্পদ মিশ্রিত হলে (৬) কোন যিম্মি (ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক) যখন কোন মুসলমানের নিকট থেকে জমি ক্রয় করবে তখন ঐ যিম্মিকে তার খুম্‌স প্রদান করতে হবে, (৭) বছরান্তে যে কোন উপায়ে অর্জিত মুনাফা বা লভ্যাংশ। এই সাতটি বিষয়ে যা কিছু গনিমত (মুনাফা) স্বরূপ আমাদের হস্তগত হয় সে মালের এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে 'খুম্‌স'। যেমন- ১০০/= টাকা গনিমত বা মুনাফা হলে ২০/= টাকা খুম্‌স হবে। খুম্‌স বছরের যে কোন সময় মুকাল্লাফ (যার ওপর ওয়াজিব হয়েছে) ব্যক্তির সুবিধা অনুযায়ী বাৎসরিক তারিখ নির্দিষ্ট করে আদায় করতে হয়। এগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিতাবাদিতে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

ইসলামের সকল ফকীহবৃন্দ বিশ্বাস করেন, যে সমস্ত যুদ্ধলব্ধ গনিমত জিহাদকারীদের মধ্যে বন্টিত হয়, শুধুমাত্র এর এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত যা বিশেষ ক্ষেত্রে খরচ করা হয়। ইমামীয়া বা জাফরী মাযহাবের ফকীহদের সাথে অন্যান্য ফকীহদের পার্থক্য হলো এই যে, অন্যেরা খুম্‌সকে শুধুমাত্র যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করেন এবং তা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে ওয়াজিব আছে বলে মনে করেন না। এ আয়াতটি যুদ্ধলব্ধ গনিমতের ব্যাপরে নাযিল হয় বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। এখানে গনিমত শব্দের আক্ষরিক অর্থ ব্যাপক। কোন ব্যক্তির সকল প্রকার আয় এর আওতাধীন। কারণ আরবী ভাষায় যা কিছুই মানুষের হস্তগত হয় তাকেই গনিমত বলা হয় এবং শুধুমাত্র যুদ্ধলব্ধ গনিমতকেই বুঝায় না। মূলতঃ 'গনিমত' কথাটি হলো 'গারামত' বা 'খেসারত' এর বিপরীত শব্দ। যখন মানুষ কোনো কিছু লাভ করা ব্যতীত এক নির্দিষ্ট পরিমাণ জরিমানা দেয়ার জন্য আদিষ্ট হয়, তাকে 'গারামাত' বা 'খেসারাত' বলে। যখন লাভবান হয় তাকে গনিমত বলে।

মুশরিকদের ভয়ে মদীনায় আসতে না পারা এমন একদল লোককে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান, নামায কায়েম, যাকাত আদায় এবং গনিমতের (আয়ের) এক-পঞ্চমাংশ আদায় করবে।" (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং-১৩১৭, পৃষ্ঠা-৫)। এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, যে ব্যক্তিবর্গ মুশরিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হতে অপারগ ছিল। তারা কি করে যুদ্ধলব্ধ গনিমতের দ্বারা খুম্‌স প্রদান করবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে খুম্‌সের একাংশ নবী (সাঃ)-এর নিজের, একাংশ তাঁর নিকটাত্মীয়দের ও একাংশ তাঁর বংশের ইয়াতিম ও মিসকিনদের দিতেন। এক-পঞ্চমাংশ (খুম্‌স) দিতে হবে- (১) আল্লাহ, (২) তাঁর রাসূল (সাঃ), (৩) রাসূল (সাঃ) এর আত্মীয় স্বজনদের (৪) তাঁর বংশের ইয়াতিম ও মিসকিনদের ও মুসাফিরের জন্য। উল্লেখ্য যে, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর সময় থেকেই রাসূল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর নিকটাত্মীয়দের খুম্‌সের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। মালিক ইবনে আনাস (রঃ) (৯৩-১৭৯হিঃ) খুম্‌সের বিষয়ে ফতোয়া দেন যে, "এটি শাসক বা সুলতানের হাতে অর্পণ করতে হবে ও তিনি যেমনভাবে চান তা ব্যয় করবেন।" হযরত আবূ হানীফা (রঃ) (৮০-১৫০হিঃ) ফতোয়া দেন যে, "খুম্‌সকে তিন ভাগে ভাগ করে মুসলমানদের ইয়াতিম, মিসকিন ও সম্বলহীন মুসাফিরের মধ্যে বন্টন করতে হবে।" তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকটাত্মীয়দের সাথে অন্যদের পার্থক্য করেন নি। (সূত্র : আল-মুরাজায়াত, বাংলা অনুবাদ, প্রথম সংস্করণ, ৪১২ পৃষ্ঠা)।

খুম্‌স দু'ভাগে ভাগ করতে হবে। এক- সাহমে ইমাম বা ইমামে যামানা মাহ্‌দী (আঃ) এর অংশ যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পর ইমাম (আঃ) গণের অংশ ছিল যা এখন তাঁদেরই নির্দেশ অনুযায়ী একজন ন্যায়পরায়ণ মুজতাহিদকে দিতে হবে। দুই- সাহমে সাদাত বা সৈয়দদের অংশ। সাহমে সাদাত (সৈয়দদের অংশ) যা সৈয়দগণকে দিতে হবে। যেসকল সৈয়দগণ এতিম, মিসকিন অর্থাৎ যার কাছে এক বছরের খরচের অর্থ থাকবে না। এই সম্পর্কে হযরত ইমাম খোমেইনী (রঃ) বলেন, "খুম্‌সের মালে হাশেমী বংশের লোকদের যে হক রয়েছে তা শুধু এতটুকু পরিমাণ যা তাদের মধ্যম মানের ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজন। তা সত্বেও তারা খুম্‌স তহবিল থেকেই তাদের প্রয়োজন মত গ্রহণ করতে পারবেন, তার অধিক কিছুই নয়। এ পর্যায়ে হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, তাদের বাৎসরিক প্রয়োজন পূরণের পর যা উদ্ধৃত্ত থাকবে, তা তারা বাইতুল মালে ফেরত দিতে বাধ্য হবেন। পক্ষান্তরে তাদের প্রাপ্ত অংশ দিয়ে তাদের সাংবাৎসরিক প্রয়োজন পূরণ না হলে বাইতুল মাল থেকে প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ সম্পদ লাভ করতে পারবেন।" [সূত্র : ইসলামী বিপ্লব কি ও কেন, ইমাম খোমেইনী (রহঃ), বাংলা অনুবাদ-প্রকাশকঃ ডন পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৬]।

আর সেই সব মুসাফির তার সফরের খরচ শেষ হয়ে গেছে। যদিও তিনি তার দেশে সম্পদশালী। এতে তাদের ছাড়া অন্যদের কোন অংশ নেই। তবে যে সকল সৈয়দগণ কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী বা নিজস্ব অন্য ক্ষেত্র থেকে আয় আছে, যা তাদের জীবন নির্বাহের খরচ মিটানোর জন্য যদি যথেষ্ট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তারা খুম্‌সের হকদার হবে না। শুধুমাত্র খুম্‌স সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ সৈয়দগণের অংশ মুজতাহিদের অনুমতি ছাড়াও তাদের নিকট পৌছাতে পারে কিন্তু তারপরও মুস্তাহাব হচ্ছে মুজতাহিদ বা তার প্রতিনিধিকে দেয়া বা তার অনুমতি নেয়া। সতর্কতামূলক ওয়াজিব হচ্ছে একজন সৈয়দকে এক বছরের বেশী খুম্‌স না দেয়া। সে বার ইমামী বিশ্বাস হওয়া; উক্ত টাকা পাপ কার্যে খরচ না করা এবং সে প্রকাশ্যে পাপচারী না হওয়া।

ইমামে যামানা মাহ্‌দী (আঃ) খুম্‌স এর অংশ (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অংশ) তাঁর অদৃশ্যে (অন্তর্ধানে) থাকা কালে একজন ন্যায়পরায়ণ মুজতাহিদের কাছে সরাসরি অথবা তার অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছে জমা দিতে হবে। তিনি ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর একজন প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হবেন। এ অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে এবং গরীব ও অভাবী সদস্যদের সাহায্যের জন্য ব্যয় করা যাবে অথবা সেই মুজতাহিদ যে সব খাতে ব্যয় করার অনুমতি দিবেন সে খাতে ব্যয় করা যাবে।

সাইয়্যেদ হওয়ার শর্ত :

(১) সেই সাইয়্যেদের জন্যেই খুম্‌সের অংশ ব্যবহার করা জায়েজ যে পিতার দিক থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্র-পিতামহ হযরত হাশিমের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবেন। যদিও মায়ের দিক থেকে যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত তারাও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশধর বলে গণ্য হয়। কিন্তু সাদাতের শারয়ী হুকুম জারি হওয়া শুধুমাত্র পিতার দিক থেকে সম্পর্কযুক্তদের জন্যই প্রযোজ্য।

(২) কারো নামের সাথে সৈয়দ কথা উল্লেখ থাকাই তার সাদাত (সৈয়দ) হওয়ার শারয়ী হুজ্জাত বলে গণ্য হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিম্বা শারয়ী দলিলের ভিত্তিতে স্বীয় সৈয়দ হওয়াকে প্রমাণিত না করবে অর্থাৎ পিতার দিক থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্র-পিতামহ হযরত হাশিমের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হবেন। ততক্ষণ সাদাতের শারয়ী হুকুম প্রযোজ্য হবে না। অনেক সময় দেখা যায় একদেশ থেকে অন্যদেশে বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হলে প্রকৃত বংশগত পরিচয় গোপন করে বা অন্য বংশে জন্ম গ্রহণ করলে সৈয়দ বংশে জন্ম গ্রহনকারী হিসেবে নিজ পরিচয় দেওয়া যায়েজ নয় যা গোনাহ্‌র কাজ। যেমন- ভারত বা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে এসে নামের আগে সৈয়দ নামধারণ করা বা মীর বা মির্জা থেকে সৈয়দ একই বংশ মনে করা।

(৩) পোষ্যপুত্রের ওপর শারয়ী পুত্রত্বের হুকুম প্রয়োজ্য হয় না। আর যে ব্যক্তি তার প্রকৃত পিতার পক্ষ থেকে সাইয়্যেদ নয় তার জন্য সাদাতের হুকুম প্রযোজ্য

হবে না। (সূত্র : রাহবার আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী) ফতোয়া অনুযায়ী রচিত, আহ্কাম শিক্ষা, ১ম খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা)।

মারজায়ে তাকলীদকে খুমস দেওয়া :

(১) প্রত্যেক মারজা'র মুকাল্লিদবৃন্দ যদি খুমসের উভয় ভাগ পরিশোধের ক্ষেত্রে স্ব স্ব মারজা'র ফতোয়া অনুযায়ী আমল করেন তাহলে তারা দায়মুক্ত।
(সূত্র : রাহবার আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী) ফতোয়া অনুযায়ী রচিত, আহ্কাম শিক্ষা, ১ম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)।

(২) রাহবার হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী)- এর ফতোয়া অনুযায়ী, মুকাল্লিদবৃন্দ তার খুমস আদায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধির কাছে খুমস আদায়ের অনুমতিপত্র দেখতে এবং টাকা প্রদানের সীলমোহরকৃত রসিদ চাইতে পারেন। (সূত্র : আজবেবাতুল ইস্তফতাআত, ১ম খন্ড, প্রশ্নের উত্তর-১০৩২)।

(৩) যদি কোন মুজতাহিদের প্রতিনিধির প্রতি খুমস, যাকাত ইত্যাদির বেঠিক খাতে ব্যয় করার অভিযোগ ওঠে তাহলে উক্ত প্রতিনিধির প্রতি উল্লেখিত অভিযোগ সত্য হোক বা না হোক কথাটা ছড়ানো জায়েজ নয়। আর যদি সত্য হয় তাহলে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে শুধু মুজতাহিদকে প্রকৃত অবস্থায় অবগত করা যেতে পারে যাতে তিনি স্বয়ং সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেন।
(সূত্র : মারজায়ে তাকলীদ আয়াতুল্লাহ সৈয়দ আলী হুসাইনী সিস্তানীর (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী) ফতোয়া অনুযায়ী রচিত 'যুগের সমস্যা ও ফেকাহ্ শাস্ত্রের সমাধান' বাংলা অনুবাদ, প্রকাশক-ঈমান ফাউন্ডেশন, নাজাফী হাউজ, মুম্বাই, ভারত, ৫৯২নং প্রশ্নের উত্তর।)

(৪) উল্লেখ্য, জাকাত, ওশর, খুমস, ও সাধারণ দান থেকে প্রত্যেক মারজা'র নিকট একটি বিরাট তহবিল গড়ে ওঠে যা দ্বীনি শিক্ষার বিস্তার, তাবলীগ ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। এ তহবিল পরিচালনা ও ব্যবহার করতে গিয়ে প্রত্যেক মারজা'কে একটি অফিস পরিচালনা করতে এবং সেজন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী ও বিভিন্ন এলাকায় প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হয়। এ তহবিল মারজা'র ব্যক্তিগত তহবিল নয়, তিনি শুধুমাত্র পরিচালক হিসেবে এ তহবিল থেকে একটি ভাতা গ্রহণ করেন মাত্র, তেমনি এ কর্মচারীরাও তার ব্যক্তিগত কর্মচারী নন। (সূত্র : ইরানের সমকালীন ইতিহাস, পৃষ্ঠা-২১৯, প্রকাশক-ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।) এ কথাটি মারজা'র প্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য।

খুমস বর্ষ শুরু : খুমসবর্ষকে সৌর কিম্বা চন্দ্র বর্ষ অনুযায়ী নির্ধারণ করা যায়। তা নির্বাচনের ব্যাপারে মুকাল্লাফ ব্যক্তি স্বাধীন। খুমসবর্ষের শুরু স্বয়ং মুকাল্লাফ ব্যক্তির পক্ষ থেকে নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না। বরং এটা একটা বাস্তবতা যা নিজে নিজে বাৎসরিক আয়ের পদ্ধতিগত ভিত্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

যাকাতুল ফিত্‌র (ফিতরা)

সাদাকাতুল ফিতর হলোঃ 'সাদাকাহ্' আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ দান। পরিভাষায়- যে দান দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াবের আশা করা যায় তাকে সাদাকাহ্ বলে। 'আল-ফিত্‌র' আরবী শব্দ। ফকীহ্‌দের পরিভাষায় তা হল- রোযা না রাখা। এ অর্থেই ব্যবহার হয় 'ঈদুল ফিত্‌র' বাক্যটি। পরিভাষায় ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় মালিকে-নিসাব (যাকাত ওয়াজিব হবার জন্য ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদের মালিক) ব্যক্তির উপর যে সাদাকা ওয়াজিব হয় তাকে সাদাকাতুল ফিত্‌র বলে। এর অপর নাম 'যাকাতুল ফিত্‌র' যাকে সাধারণত 'ফিতরা' বলা হয়ে থাকে। মূলত পবিত্র মাহে রমযানের রোযা পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক বান্দার প্রতি যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন তার শুকুর হিসেবে এবং রোযা পালনের মূল উদ্দেশ্য সাধনে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' ওয়াজিব করা হয়েছে। আল-কুরআন ও হাদীসে 'সাদাকা' শব্দটি যেমন যাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্রুপ নফল সাদাকা অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ 'যাকাত' শব্দটিও উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ফিক্‌হ-এর পরিভাষায় শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দানের যোগ্য অংশ আদায় করাকে 'যাকাত' এবং নফল দান করাকে 'সাদাকা' বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "প্রতিটি জিনিসের যাকাত রয়েছে। আর শরীরের যাকাত হচ্ছে রোযা।" [সূত্র : আল-কুলাইনী (মৃত্যু- ৩২৯), আল-কাফি, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬২, হাদীস-৩]।

হযরত ইমাম বাকের (আঃ) হতে বর্ণিত, "নেকী এবং সাদাকা দারিদ্রতাকে দূরিভূত করে, আয়ু বৃদ্ধি করে এবং সাদাকাদাতা ও নেকীকারকে সত্তর রকমের অপমৃত্যু ও অশুভ মৃত্যুকে দূরীভূত করে।" [সূত্র : শেইখ সাদুক, (মৃত্যু-৩৮১ হিঃ), আল-খিসাল, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫]

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেছেন, "যাকাতুল ফিত্‌র প্রদানের মাধ্যমে রোযা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, যেরূপ রাসূল পাক (সাঃ)-এর উপর সালাওয়াত পাঠ করার মাধ্যমে নামায পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।" [আল হুর আল আমিলী (মৃত্যু-১১০৪ হিঃ) ওয়াসায়িলুশ শিয়া, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২২১, হাদীস-৫)।

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাদাকাতুল ফিতরা হিসেবে এক 'ছা' পরিমাণ খেজুর বা এক 'ছা' পরিমাণ যব দিয়ে আদায় করতে নির্দেশ দেন। তার পর লোকেরা যবের সমপরিমাণ হিসেবে দু' 'মুদ্দ' (অর্ধ সা') গম আদায় করতে থাকে।" (সূত্র : বুখারী শরীফ, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং-১৪১৯, পৃষ্ঠা-৬২)।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সাঃ)-এর যুগে এক 'ছা' খাদ্যদ্রব্য বা এক 'ছা' খেজুর বা এক 'ছা' যব বা এক 'ছা' কিসমিস দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম। মুয়াবিয়া-এর যুগে যখন গম আমদানী হল তখন লোকেরা যবের সমপরিমাণ হিসেবে দু' 'মুদ্দ' (অর্ধ 'ছা') গম আদায় করতে থাকে। (সূত্র : বুখারী শরীফ, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ইফাবা), হাদীস নং- ১৪২০, পৃষ্ঠা-৬২)।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন আমরা ছোট ও বড় স্বাধীন ও ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ হতে সাদাকাতুল ফিতর বাবদ এক 'ছা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক 'ছা' পনির অথবা এক 'ছা' যব অথবা এক 'ছা' খেজুর অথবা এক 'ছা' কিসমিস প্রদান করতাম। এভাবেই আমরা তা আদায় করতে থাকি। পরে মুয়াবিয়া ইবনে সুফিয়ান হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে যখন আমাদের নিকট আসলেন তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করে উপস্থিত লোকদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমার মতে সিরিয়ার দু' 'মুদ্দ' গম এক 'ছা' খেজুরের সমান। লোকেরা তা গ্রহণ করে নিলেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি তো যত দিন জীবিত থাকব ঐভাবেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করব, যে ভাবে আমি (পূর্বে) আদায় করে আসছিলাম।" [সূত্রঃমুসলিম শরীফ, তৃতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং ২১৫৩, পৃষ্ঠা-২৯৯; তিরমিযী শরীফ, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং-৬৭০, পৃষ্ঠা-৪৮]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, মুয়াবিয়া যখন অর্ধ 'ছা' গমকে এক 'ছা' খেজুরের সমপরিমাণ নির্ধারণ করলেন, তখন তিনি [আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)] তা মেনে নিলেন না এবং বললেন, আমি সাদাকাতুল ফিত্‌র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়ে যা আদায় করতাম এখনও তাই আদায় করব-এক 'ছা' খেজুর অথবা এক 'ছা' কিসমিস অথবা এক 'ছা' যব কিংবা এক 'ছা' পনির।" [সূত্র : মুসলিম শরীফ, তৃতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং ২১৫৬, পৃষ্ঠা-৩০০]।

এখানে একটি বিষয় স্মরণের জন্য উল্লেখ করতে চাই তা হলো, মুয়াবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ান প্রায় ২০ বছর যাবত রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে যুদ্ধ করে। শুধু তাই নয়, শেষের ৫/৬ বছর সে ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং ফেতনা সৃষ্টিতে সরদারের ভূমিকা পালন করে। মুয়াবিয়া তার পিতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতায় নামে। আবু সফিয়ানের স্ত্রী অর্থাৎ মুয়াবিয়ার মাতা হিন্দা ওহুদের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহর (সাঃ) চাচা হযরত হামজা (রাঃ) এর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল। সেই অসংখ্য শহীদদের লাশ বিকৃত করার কাজে অংশ নেয়। হযরত হামজা (রাঃ) শহীদ হন হিন্দার ভাড়া করা যুদ্ধা ওয়াহশীর হাতে। হিন্দা ছিল নিজ যুগের নির্লজ্জ, দুশ্চরিত্র, পশুসূলভ আচরনের অধিকারিনী। সে আবু সুফিয়ানের পাশে থেকে ইসলামের বিরোধিতা করত। 'বদর' যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের শশুর (অর্থাৎ হিন্দার পিতা) উতবা ইবনে

রাবীয়া, শ্যালক ওয়ালিদ ইবনে উতবা, চাচাতো শশুর শাইবা ইবনে উতবা এবং নিজ পুত্র হানযালা ইবনে সুফিয়ান কাফের বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করতে যেয়ে নিহত হয়। তারা ছিল যুদ্ধে কাফের বাহিনীর পক্ষে প্রধান ভূমিকা পালনকারীগণ। আবু সুফিয়ান এবং মুয়াবিয়া মক্কা বিজয়ের পর বাধ্য হয়ে যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখনও মুয়াবিয়ার মাতা হিন্দা তাদের তিরস্কার করে ইসলাম গ্রহণের জন্য। অথচ আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে প্রত্যক্ষ করি যে, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের মাত্র দশ বছর পরে সেই মুয়াবিয়া এসে ইসলামী শাসনযন্ত্রের শীর্ষে আরোহরণ করে শাম বা সিরিয়ার গভর্নর হয়ে বসে। আর বিশ বছর পরে ইসলামের এই শত্রু হয়ে বসলো স্বয়ং মুসলমানদের খলীফা! এখানেই শেষ নয়, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের পঞ্চাশ বছর পর এবার মুসলমানদের খলীফা হল মুয়াবিয়ার মূর্খ ও নির্বোধ এবং প্রকাশ্যে মদ্যপানকারী পুত্র ইয়াযিদ। আর এই ইয়াযিদ এর নির্দেশে মহানবী (সাঃ)-এর দৌহিত্র, ইমাম আলী (আঃ) ও হযরত ফাতিমা (সাঃ আঃ)-এর দ্বিতীয় সন্তান, জান্নাতের সরদার ইমাম হোসাইন (আঃ)-কে ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে, উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে তাঁর পরিবারের লোকজন সহ ৭২ জন মজলুম মুসলমানকে পিপাসার্ত অবস্থায় নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে শহীদ করা হলো।

যাকাতুল ফিত্‌র-এর শর্ত :

(১) নিজ সম্পদে যাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হবার জন্য বালেগ হওয়া, বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া ও সামর্থ্য থাকা জরুরী। সুতরাং শিশু ও পাগলের সম্পদে যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। "এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক অপ্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, নারী, স্বাধীন এবং গোলামের উপর (গোলামের মালিকের উপর আদায় করা) এক 'ছা' করে খেজুর অথবা এক 'ছা' করে যব সাদাকায়ে ফিত্‌র স্বরূপ ওয়াজিব করেছেন।" (সূত্র : সুনানু নাসাঈ শরীফ, তৃতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ, ইফাবা, হাদীস নং ১৪২৪, পৃষ্ঠা-৬৪;)।

(২) যাকাতুল ফিত্‌র প্রদানের সামর্থ বা সক্ষম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তার নিজ ও পরিবার-পরিজনের বাৎসরিক প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ ধন-সম্পদের মালিক অথবা কাজের মাধ্যমে তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়।

(৩) যে ব্যক্তির ওপর তার নিজের জন্য এবং ঈদুল ফিত্‌রের রাতে যারা তার ঘরে খানা-পিনা করবে তাদের সকলের জন্য যাকাতুল ফিত্‌র প্রদান করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে তাদের ভরণ-পোষণ তার ওপর ওয়াজিব কিনা তাতে কোন পার্থক্য নেই। তেমনি ছোট-বড়, রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয় ও দূরদেশ থেকে আগত অপরিচিত ব্যক্তি, এমন কি শাওয়ালের চাঁদ দেখা যাবার কয়েক মুহূর্ত পূর্বে আগত মেহমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এদের সকলেই ঐ রাতের জন্য তার ঘরে খাদ্য গ্রহণকারীরূপে গণ্য হবে এবং তার ওপরে তাদের সকলের জন্য যাকাতুল ফিত্‌র প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

(৪) একইভাবে ঈদুল ফিত্‌রের রাত শুরু হবার পূর্বে অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বে বা

সময়ে তার যে শিশু জন্ম হবে বা যে নারীর সাথে তার বিবাহ হবে তাদের জন্য যাকাতুল ফিত্‌র প্রদান করা তার জন্য ওয়াজিব হবে। কিন্তু সূর্যাস্তের পরে সন্তান জন্ম নিলে বা স্ত্রী পরিগ্রহণ করলে বা মেহমান এলে তাদের জন্য যাকাতুল ফিত্‌র প্রদান করা তার জন্য ওয়াজিব হবে না।

(৫) আর যার যাকাতুল ফিতর প্রদান করা অন্যের ওপর ওয়াজিব হয়েছে তার নিজের ওপরে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব থাকে না, এমন কি সে ধনী হলেও।

(৬) ঈদুল ফিত্‌রের রাত শুরু হবার সাথে সাথে যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়। আর ঈদুল ফিত্‌রের রাত শুরু হবার পর থেকে ঈদের দিন দুপুর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তা আদায় করা ওয়াজিব। তবে ঈদুল ফিত্‌রের নামাযের পূর্বে আদায় করা উত্তম। রোযার ঈদের নামাযে যাবার পূর্বে ফিত্‌রা আদায় করে নেয়া মুস্তাহাব। "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিত্‌রের দিন সালাতের উদ্দেশ্যে অতি ভোরে রওনা হওয়ার আগেই (যাকাত-ফিতরা) আদায় করে দিতে নির্দেশ দিতেন। আর আলিমগণের অভিমত যে, "ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে ভোরে বের হওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিত্‌রা আদায় করা মুস্তাহাব।" (সূত্র : তিরমিযী শরীফ, তৃতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং-৬৭৪, পৃষ্ঠা-৫১)।

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকদের ঈদের সালাতে গমনের পূর্বেই সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।" (সূত্র : মুসলিম শরীফ, তৃতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ইফাবা, হাদীস নং ২১৫৮, পৃষ্ঠা-৩০১)।

এ সময়ের মধ্যে যদি এর হকদার (যাকাতুল ফিত্‌র পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি) না পাওয়া যায় তাহলে মুকাল্লিফের দায়িত্ব হচ্ছে হকদার পাবার সাথে সাথে তাকে প্রদানের নিয়্যতে নিজ সম্পদ থেকে তা আলাদা করে রাখা। আর যদি হকদার পাওয়া সত্ত্বেও তা প্রদান না করে থাকে তাহলে তা পরে প্রদান করা ওয়াজিব হবে। কোন অবস্থায় তার ওপর থেকে এ ওয়াজিব বিলুপ্ত হবে না।

(৭) যখন কোন স্থানে ফিত্‌রা পাওয়ার অধিকারী বর্তমান থাকে তাহলে কর্তব্য হচ্ছে যে, অন্য জায়গায় ফিত্‌রা না নিয়ে যাওয়া। যদি সেখানে কেউ ফিত্‌রা পাওয়ার যোগ্য না থাকে তাহলে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারে যেখানে পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি রয়েছে। আর উত্তম হচ্ছে যেখানে তার উপর ফিত্‌রা ওয়াজিব হয়েছে সেখানকার লোকদেরকেই দেয়া। যদিও তার দেশ বা গ্রাম অন্য কোথাও হোক।

(৮) যারা ফিত্‌রা পাওয়ার হকদার তাদেরকে কমপক্ষে একজনের পূর্ণ ফিতরা দেয়া উত্তম।

(৯) সতর্কতামূলক কর্তব্য হলো যে, ফিত্‌রা 'ইমামীয়া মাজহাব' অর্থাৎ আহ্‌লে বাইতের অনুসারীদের দেয়া। তবে সূরা তাওবার ৬০নং আয়াত অনুযায়ী আট শ্রেণীর লোক যাকাতের হকদার। তারাই যাকাতুল ফিতরের হকদার। সে অনুযায়ী 'আল মুয়াল্লাফাতু কুলূবুহুম' (যাদের অন্তরকে জয় করার প্রয়োজন

আছে) বলতে সেই লোকদেরকে বোঝায় যাদেরকে ইসলামের স্বার্থে যাকাত থেকে একটি অংশ দিতে হয়। এমন ব্যক্তি যে যাকাতের অর্থ পেলে পরে ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে যাবে এবং অন্য মাযহাবের লোক যাদের দিলে 'ইমামীয়া মাযহাব' এর অনুসারী হওয়ার সুযোগ আছে। 'মুয়াল্লাফাতু কুলূবুহুম' অংশের যাকাত মুসলিম-অমুসলিম উভয়কেই দেয়া যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে, এ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ হাসিল হবে।

যাকাতুল ফিতর এর পরিমাণ :

(১) যাকাতুল ফিত্‌রের পরিমাণের ব্যাপারে হানাফী মাযহাব ছাড়া ইসলামের অন্য সকল মাযহাবের মধ্যে প্রায় অভিন্ন মত রয়েছে। তা হচ্ছে এক ব্যক্তির জন্য দেয় যাকাতুল ফিত্‌রের পরিমাণ এক 'ছা'। আর ফিত্‌রার পণ্যগুলি হচ্ছে- গম, যব, খোরমা (খেজুর), শুষ্ক আঙ্গুর (কিসমিস), পনির, চাল, ভুট্টা বা এ জাতীয় অন্য কোন প্রধান খাদ্য যা ফিত্‌রা প্রদানকারীর আহারে প্রধান খাবার হিসেবে গণ্য হয়।

(২) এক 'ছা' = ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম। ২ 'মুদ্দ' = এক 'ছা' এর অর্ধেক অর্থাৎ ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম।

(৩) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং পরবর্তী চার খলিফার যুগে ফিত্‌রার পরিমাণ এক রকম ছিল অর্থাৎ এক 'ছা' (৩ কেজি ৩০০ গ্রাম)। কিন্তু শাসক মুয়াবিয়া এ পরিমাণকে পরিবর্তন করে অর্ধেক নির্ধারণ করে যা ইয়াজিদ এবং পরবর্তীতে উমাইয়া এবং আব্বাসিয় শাসকরা অব্যাহত রাখে। এক 'ছা' এর অর্ধেক (১ কেজি ৬৫০ গ্রাম) যা হানাফী মাযহাবের ভিতর প্রচলিত। যেমন- একজন ফিত্‌রা প্রদানকারীর আহারে প্রধান খাবার হিসেবে যে চালটিকে গন্য করে এবং সেই চাল এর মূল্য যদি কেজি প্রতি ৪০.০০ টাকা হয় তাহলে তার ফিত্‌রা এক 'ছা' অনুযায়ী হবে ৪০.০০ টাকা গুন ৩.৩০০ = ১৩২.০০ টাকা। আর হানাফী মাযহাব অনুযায়ী- ২ 'মুদ্দ' = এক 'ছা' এর অর্ধেক অর্থাৎ ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম এর ফিত্‌রা হবে: ৬৬.০০ টাকা। উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরও কেউ যদি ঘোষণা করে যে, মাথাপিছু ফিত্‌রার টাকার অংক হচ্ছে ৬৬.০০ টাকা, তাহলে ভুল হবে। কারণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর প্রকৃত ঘোষণা অনুযায়ী ফিত্‌রা হওয়ার উচিত ১৩২.০০ টাকা।

(৪) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে ফিত্‌রার পণ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন তবে তা কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের মধ্যে। তবে ফিত্‌রা প্রদানের ক্ষেত্রে পণ্য নয়, পরিমাণ-ই মূল বিবেচ্য বিষয়। যাকাতুল ফিত্‌রের পরিমাণের ব্যাপারে সকল পক্ষের প্রকাশিত হাদীস গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্টভাবে অভিন্ন হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। তারপরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো ফিত্‌রার এ পার্থক্যের পরিমাণ দ্বিগুণ! পার্থক্য থাকলেও উভয় মতের মাঝে যৌক্তিক, সুক্ষ্ম মর্মগত মিল থাকা স্বাভাবিক ছিল।

ঈদের নামায
(ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায)

'ঈদুল ফিতর' অর্থ মাহে রমযানের রোযা ভঙ্গের উৎসব। মাহে রমযানের শেষে শাওয়ালের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করা হয়। আর 'ঈদুল আযহা' অর্থ 'কুরবানি'র উৎসব। আমাদের দেশে এ ঈদকে 'কুরবানির ঈদ' বা 'বাক্‌রা ঈদ' নামেও অভিহিত করা হয়। এ দু' ঈদের নামায আদায়ের নিয়ম হলো :

(১) ঈদুল ফিতর ও ঈদে কুরবানি'র নামায মাসুম ইমাম (আঃ) গণের যুগে ওয়াজিব এবং জামাত সহকারে আদায় করতে হতো।

(২) উক্ত দু' ঈদের নামায মাসুম ইমামের অনুপস্থিতির যুগে (বর্তমানে) মুস্তাহাব। তবে জামাত সহকারে পড়তে চাইলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশার নিয়্যতে নামায আদায় করা। অর্থাৎ এই নিয়্যতে যে, যদি জামাত সহকারে আদায় করা হয় তা যেন আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হয়। ঈদের নামায একাকী (ফোরাদা) আদায় করা যায়।

(৩) এ দু' ঈদের নামায পড়ার ওয়াক্ত হচ্ছে সুর্যোদয় থেকে যোহরের সময় শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত এবং দু' ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নেই।

(৪) এ দু' ঈদের নামাযে কোন আযান ও ইকামত নেই। বরং এর পরিবর্তে একজন ব্যক্তি উচ্চস্বরে মসজিদের বাহিরে গিয়ে তিন বার "আস-সালাত" বলে নামাযের শুরু ঘোষণা করা মুস্তাহাব। যদি পেশ ইমাম ঈদের নামাযে ইকামত দেয় তাহলে তার এবং মুক্তাদির নামায শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি নেই। ঈদের নামাযের কাযা নেই।

(৫) ঈদুল ফিতর এবং ঈদে কুরবানি'র নামায দুই রাকাত, যাতে রয়েছে নয়টি কুনুত। প্রথমে তাকবীরাতুল ইহরাম (আল্লাহু আকবার) বলে নামায শুরু করা। এর পর প্রথম রাকআতে সূরা হামদ ও অন্য সূরা পাঠ করার পরে পাঁচ তাকবীর বলতে হবে। প্রত্যেক তাকবীরের পরে একটি কুনুত পড়তে হবে। পঞ্চম কুনুতের পর আরেকটি তাকবীর বলে রুকুতে যেতে হবে। অতঃপর দু'টি সিজদা করতে হবে এবং উঠে দাঁড়াতে হবে। দ্বিতীয় রাকআতে প্রথমে সূরা হামদ ও অন্য সূরা পাঠ করার পরে চারবার তাকবীর বলতে হবে এবং প্রত্যেক তাকবীরের পর কুনুত পড়তে হবে এবং এরপর তাকবীর বলে রুকুতে যেতে হবে। রুকুর পর দু' সিজদা সম্পন্ন করে অতঃপর তাশাহুদ ও সালাম পাঠ করে নামায শেষ করতে হবে।

কুনুত কি?

'কুনুত' এর শাব্দিক অর্থ বিনয় সহকারে আনুগত্য প্রকাশ করা। যেমন- আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মরিয়ম (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন, "ইয়া মারইয়ামুক্‌নতী লিরাব্‌বিকি"- "হে মার্‌ইয়াম তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও।" (সূরা আল-ইমরান-৪৩)। কিন্তু নামাযের মধ্যে কুনূতের অর্থ হলো; প্রত্যেক ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে হামদ ও সূরা পাঠ করার শেষে এবং রুকুতে যাওয়ার আগে হাতদ্বয়কে দোয়ার ভঙ্গিতে তুলে দোয়া পড়া। এই কাজটি মুস্তাহাব। তবে জুমআর নামাযে দু' রাকআতে দু'টি কুনুত পড়তে হয়। প্রথম রাকআতে রুকুর পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর পরে সম্পন্ন করতে হয়। নামাযের সময় ব্যতিত অন্য সময় কুনুত পাঠ শেষে হাতদ্বয়কে মুখমন্ডলে স্পর্শ করানো মুস্তাহাব। কিন্তু নামাযের মধ্যে কুনুত পাঠ শেষে হাতদ্বয়কে মুখমন্ডলে স্পর্শ করানো যাবেনা।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) সূরা মুয্‌যাম্মিল এর ৮নং আয়াত- "ওয়া তাবাত্তাল ইলাইহি তাবতীলা"- "তার দিকে নিমগ্ন হও খুবই নিমগ্ন হয়ে (একনিষ্ঠভাবে)।" এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'তাবাত্তাল' সেটি যে, নামাযের মাঝে দোয়ার সময় আমরা হস্তদ্বয়কে উঁচু করি। (সূত্র : ওয়াসায়েল, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১৯৭)। মুফরাদাতে লোগাত বইতে বলা হয়েছে, 'তাবাত্তাল' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, "আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর আশা প্রকাশ না করা।" হযরত ইমাম আলী রেজা (আঃ) এক পত্রে লিখেন, "দিবা রাত্রির প্রত্যেক নামাযের কুনুত হচ্ছে একটি আবশ্যকীয় সুন্নাত।" (সূত্র : বিহারুল আনওয়ার, খন্ড-৮২, পৃষ্ঠা-১৯৭)।

কুনুতের নিয়ম-কানুনের মধ্যে এসেছে হস্তদ্বয়কে মুখমন্ডল পর্যন্ত উঁচু করতে হবে। হাতের তালুদ্বয় আসমানের দিকে সম্প্রসারিত থাকবে। উভয় হাতকে পাশাপাশি রাখতে হবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অন্যান্য আঙ্গুলগুলোকে একটি অপরটির সঙ্গে রাখতে হবে। দোয়া পাঠের সময় হাতের তালুর দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং দোয়া উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে। তবে জামাতে নামায পড়ার সময়ে কুনুত এত জোরে পাঠ করা যাবে না যাতে জামাতের ইমাম দোয়ার শব্দ শুনতে পান। [সূত্র : হযরত ইমাম খোমেইনী (রহঃ), তাওযীহুল মাসায়েল, কুনুতের মাসআলাসমূহ]।

কুনুতের জন্যে বিশেষ কোন দোয়া নির্ধারিত নেই। নামাযি ব্যক্তি যে কোন যিক্‌র অথবা দোয়া পাঠ করতে পারেন। অনুরূপভাবে, এও আবশ্যক নয় যে, দোয়া আরবীতে হতে হবে। কুনুতে নিজের প্রয়োজনকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। তবে আল-কুরআনের দোয়া সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ অথবা যে দোয়াগুলো মা'সূমিন (আঃ) কুনুতে পাঠ করতেন সেগুলোর বিশেষ ফযিলত ও প্রাধান্য রয়েছে।

দুই ঈদের নামাযে কুনুত : [সূত্রঃ মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৪০৫-৪০৬; হযরত সৈয়দ ইবনে তাউস (রহঃ), ইক্‌বালুল আমল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৯৫; হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ), তাওযীহুল মাসায়েল, মাসয়ালা নং-১৫২০]।

اَللّٰهُمَّ اَهْلَ الْكِبْرِيَآءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُوْدِ وَالْجَبَرُوْتِ
وَاَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَاَهْلَ التَّقْوٰى وَالْمَغْفِرَةِ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ
هٰذَا الْيَوْمِ الَّذِىْ جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ عِيْدًا وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ ذُخْرًا وَمَزِيْدًا اَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ
مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُدْخِلَنِىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ اَدْخَلْتَ فِيْهِ مُحَمَّدًا وَاٰلَ
مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُخْرِجَنِىْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَاٰلَ
مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا
سَئَلَكَ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَا
دُكَ الصَّالِحُوْنَ .

(আল্লাহুম্মা আহলাল কিবরিয়ায়ি, ওয়াল আযমাতি, ওয়া আহ্‌লাল জুদি ওয়াল জাবারূতি ওয়া আহ্‌লাল আফ্‌য়ি ওয়ার রাহ্‌মাতি ওয়া আহলাত্ তাক্বওয়া ওয়াল মাগফিরাতি আসআলুকা বিহাক্কি হাযাল ইয়াউমিল্লাযী জা'আলতাহু লিল-মুসলিমীনা ঈদা, ওয়া লী মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি যুখরান ওয়া মাজীদান আন তুসাল্লিয়া আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মদ, ওয়া আন তুদখিলানী ফী কুল্লি খাইরিন আদখালতা ফীহি মুহাম্মাদান ওয়া আলে মুহাম্মদ, ওয়া আন তুখরিজানী মিন কুল্লি সূইন আখরাজতা মিনহু মুহাম্মাদান ওয়া আলে মুহাম্মাদিন সালাওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলাইহি'ম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরা মা সাআলাকা ইবাদুকাস সালিহূন। ওয়া আয়ূযু বিকা মিম্মাস তা'আযা মিনহু ইবাদুকাস সালিহূন।)

অর্থ : "হে আল্লাহ! তুমি সর্বাপেক্ষায় বড় এবং বৃহত্তম। এবং তুমি দাতা ও সর্বাপেক্ষা প্রদানকারী। সর্বাপেক্ষা ক্ষমাকারী ও দয়াশীল। ক্ষমা ও তাকওয়ার মালিক। আমি তোমার কাছে এই দিবসের ওসিলায় প্রার্থনা করছি যে দিবসটিকে তুমি মুসলমানদের জন্য ঈদ হিসেবে নির্ধারন করেছো এবং মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার বংশকে অতি ভারী ও মূল্যবান সম্পদ বানিয়েছো ও বৃদ্ধি করেছো। এ মর্মে মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁহার বংশধারার উপর রহমত বর্ষিত হউক। এবং আমাকে সমগ্র কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করাও যেমনটি মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরগণকে প্রবেশ করেছো। এবং আমাকে সমস্ত মন্দ থেকে বাহির কর যেমন মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণকে বাহির করেছো। তোমার অফুরন্ত শান্তি বর্ষণ কর তাঁর (সাঃ) ও তাঁর বংশধরগণের উপর। হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে নেক ও সৎ কামনা করছি যা তোমার নেকবান্দাগণ কামনা করেছেন। এবং আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি যে ভাবে তোমার নেকবান্দাগণ আশ্রয় কামনা করেছেন।"

(৬) ঈদের নামায যদি জামাতে পড়া হয়, তাহলে নামায শেষে ইমামকে পরপর দু'টো খুতবা দিতে হবে। উক্ত খুতবায় জনগণকে সদুপদেশ ও শিষ্টাচারের পরামর্শ দেয়া ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর তিনি বক্তব্য রাখবেন। ঈদুল ফিতরের নামাযে ঈদুল ফিতর সংক্রান্ত আহকাম ও ফিতরার সংক্রান্ত আহকাম বর্ণনা করবেন। ঈদে কুরবানি'র নামাযে কুরবানি সংক্রান্ত আহকাম বর্ণনা করবেন।

উল্লেখ্য যে, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুতবার পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করতেন, পরে খুতবা দিতেন, বলা হয় মারওয়ান ইবনুল হাকামই (উমাইয়া শাসক) সর্বপ্রথম (ঈদের) সালাতের পূর্বে খুতবা দেয়" এবং জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "এক-দুইবার নয়, বহুবার আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর সঙ্গে আযান ও ইকামত ছাড়া দুই ঈদের সালাত আদায় করেছি।" (তিরমিযী শরীফ, ইফাবা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, হাদীস নং-৫৩১-৩২, পৃষ্ঠা-২০১)।

(৭) ঈদের নামায একাকী অথবা জামাতে দু'অবস্থায়ই উচ্চঃস্বরে পড়া মুস্তাহাব।

(৮) ঈদের নামায সাধারণতঃ খোলা ময়দানে পড়তে হয়। ঈদের নামায ছাদের নিচে পড়া মাকরুহ। তবে ইবাদত সংক্রান্ত মাকরুহ এর অর্থ হল পুর্ণ সওয়াব থেকে কিছু কম হইবে।

(৯) মুসাল্লিগণ প্রথম জামাত না পেলে দ্বিতীয় জামাতের ব্যবস্থা থাকলে বা দ্বিতীয়বার জামাত করে ঈদের নামায আদায় করতে পারবে। অন্য দিকে আগের জামাতে নামায পড়া ব্যক্তি আবার ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় জামাতে নামায পড়তে পারবে।

(১০) উভয় ঈদের নামায আদায়ের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব।
(১১) যদি কারও ঈদের নামাযের তাকবির বা কুনুতের সংখ্যায় সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং যদি তখনও ঐ তাকবির বা কুনুতের স্থান ত্যাগ করে না থাকে তাহলে ঐ সন্দেহের ক্ষেত্রে কম সংখ্যক তাকবির বা কুনুতই হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে এবং বাকী তাকবির বা কুনুতগুলো সেরে নিতে হবে, তবে পরে যদি বুঝতে পারে যে তার সন্দেহ ঠিক নয় অর্থাৎ তার তাকবির বা কুনুতের সংখ্যা ঠিকই ছিল এবং সন্দেহের কারণে তাকে অতিরিক্ত কিছু কুনুত বা তাকবির পড়তে হয়েছে, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না।
(১২) হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) থেকে বর্ণিত, "রোযা শেষে ঈদের চাঁদ দেখার পর মাগরিব ও এশার নামাযের পর এবং ঈদের নামায পড়তে যাবার পথে এবং ঈদের দিন ফজর, যোহর, আসর ও ঈদুল ফিতরের নামাযের পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়া মুস্তাহাব।" [সূত্র : হযরত সৈয়দ ইবনে তাউস (রহঃ), ইক্‌বালুল আমল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৫৯; মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৩৯৯।]

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدٰينَا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلٰى مَا اَوْلٰينَا.

(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদু। আল-হামদুলিল্লাহি আলা মা হাদানা। ওয়া লা হুশ শুকরু আলা মা আওলানা।)

অর্থঃ "আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সেই আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন। এবং তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি আমাদেরকে পথ প্রর্দশন করার কারনে।"
(১৩) একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত, "নবম জিলহজ্ব দিবাগত রাতে মাগরিব নামায থেকে শুরু করে কুরবানি ঈদের নামায পর পর্যন্ত নিম্নো দোয়াটি মোট পাঁচবার (অর্থাৎ মাগরিব, এশা, ফজর, ঈদের নামাযর পূর্বে ও পরে) পড়তে হবে।" দ্বিতীয় একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত, "দশম জিলহজ্ব অর্থাৎ কুরবানি ঈদের দিন যোহর নামায থেকে ১২ জিলহজ্ব ফজর নামায পর্যন্ত মোট দশবার নিম্নো দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব।" (সূত্র ঃ মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৪৫৬)।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ اَلْ
حَمْدُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ عَلٰى مَا هَدٰينَا اَللّٰهُ اَكْبَرُ عَلٰى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَ

ةِ الْأَنْعَامِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا أَبْلَانَا.

(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্। আল্লাহু আকবার আলা মা হাদানা আল্লাহু আকবার, আলা মা রাযাক্না মিন বাহিমাতিল আনয়ামী ওয়াল হামদু লিল্লাহী আলা মা আবলানা।)

অর্থঃ "আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সেই আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ মহান। তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ মহান। তিনি চতুস্পদ অবলা প্রাণীর গোস্ত দ্বারা আমাদেরকে রুজি দিয়াছেন এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে, তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করেছেন।"

(১৪) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত, "জিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০দিনের একটি আমল হলো মাগরিব ও এশার সময়ের মধ্যে দুই রাকাআত মুস্তাহাব নামায পড়া। যে ব্যক্তি এ ১০দিনের আমলটি করিবে সে হাজীদের সওয়াবের অংশ পাইবে।" এ নামাযের নিয়ম হলো- প্রথম রাকাআতে সূরা হাম্দ এর পর একবার সূরা ইখলাস পড়া এবং বিসমিল্লাহ সহ সূরা আ'রাফ এর ১৪২নং আয়াতটি পড়া। আয়াতটির অর্থ হলো, "স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দ্বারা উহা পূর্ণ করি। এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারূনকে বলিল, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সংশোধন করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না'।" দ্বিতীয় রাকাআতটি তদ্রুপ ভাবে আদায় করা। (সূত্র ঃ মাফাতিহুল জিনান, পৃষ্ঠা-৪১৩)।

পরিশেষে আমাদের আহবান, ধনী ও দরিদ্র সকলে মিলে ঈদের নামাযে এক কাতারে বন্দী হয়ে ভেদহীন সমাজের আদর্শ তুলে ধরি। পরস্পর পরস্পরকে আলীঙ্গন করে ভুলে যাই হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা। আমাদের ঈদের আনন্দ হোক ভোগে নয়, ত্যাগের দ্বারা। ঈদের আনন্দের মাঝে আমাদের হৃদয় আবদ্ধ থাকুক পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারের সাথে। ঈদের পবিত্র আনন্দে নতুন করে উজ্জীবিত ও সংযত হোক আমাদের হৃদয়, মানব প্রেম ও ঈমানী ভ্রাতৃত্বের মহান শিক্ষা দ্বারা। আর তা সারা বছর অক্ষুন্ন থাকুক আমাদের জীবনে।

আল্লা হুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলে মুহাম্মদ।

সমাপ্ত

১৯শে রমযান ইমাম আলী (আঃ) আহত হন

১৫ই রমযান ইমাম হাসান (আঃ) এর পবিত্র জন্ম দিবস

১৯,২১ ও ২৩শে রমযান পবিত্র শবে কদর

মাহে রমযানের শেষ শুক্রবার বিশ্ব আল-কুদস দিবস

১লা শাওয়াল পবিত্র ঈদুল ফিতর

রুফা প্রকাশনী
Rufa Prokashoni
৭৬, বড় বয়রা মেইন রোড, খুলনা-৯০০০